মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৬, সংখ্যা-০১
ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইং, জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হি., মাঘ ১৪২৩ বাং

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية
جمادى الاولى ١٤٣٨هـ، فبرائر ٢٠١٧م

প্রতিষ্ঠাতা
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ
সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৬.... ৪
দরসে ফিকহ
পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-১০.........৮
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদুয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৩
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
বান্দার হক আদায়ের গুরুত্ব......................... ১৪
“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :
যুগশ্রেষ্ঠ মুফাস্সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ উলামায়ে কিরাম সকলেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন......... ১৬
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
তালাক প্রয়োগ-পদ্ধতি.................................. ২০
মুফতী শরীফুল আজম
ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৮.......................... ২৭
মাওলানা কাসেম শরীফ
আহ্! দারুল উলূম দেওবন্দের একজন ক্ষণজন্মা মুহাদ্দিসের প্রস্থান.................. ৩১
মাওলানা সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী
বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীন আল্লামা সলীমুল্লাহ খান (রহ.)....... ৩৫
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
রাসূল করীম (সা.)-এর জন্মতারিখ :.................. ৩৭
মুফতী রেজাউল হক
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪১
একনজরে মাসিক আল-আবরারের বিশেষ আয়োজনসমূহ....... ৪৪
হাফেজ মাওলানা সালাহ উদ্দীন

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন

ইসলামের প্রচার-প্রসারে ইজতেমা, ওয়াজ-মাহফিল, সমাবেশ, সম্মেলন ইত্যাদির অবদান অপরিসীম। যুগ যুগ ধরে ইসলামী দাওয়াতের বেলায় এই রীতি চলে আসছে।

আজ থেকে তিন দশক পূর্বেও এ দেশের প্রায় এলাকায় বড় বড় আলেম ও মুরব্বি ছিলেন। তাঁদের আওতাধীন মুসলমানদের তাঁরা তারবিয়াত দিতেন। বাড়ি বাড়ি, গ্রামগঞ্জ, পাড়া-মহল্লা, মসজিদ ও মাদরাসায় ওয়াজ-মাহফিলের ব্যবস্থা করা হতো। মুসলমানগণ হেদায়াতপ্রাপ্ত হতেন ও তারবিয়াতের আলোয় আলোকিত হতেন। পাশাপাশি তাঁরা যাঁর যাঁর সামর্থ্যানুযায়ী বিদ'আত, শিরিক ও বাতিলের মোকাবিলা করতেন।

স্বাধীনতার কয়েক বছর পর থেকে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের অগ্রনায়ক আওলাদে রাসূল হযরত সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর জাঁনশীন ফিদায়ে মিল্লাত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী (রহ.) বাংলাদেশে আগমন করতেন। শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন প্রোগ্রামে যোগ দিতেন। দ্বীনি ফিকির নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শও দিতেন।

দেশের বিভিন্ন শহরে সফর করে একসময় হযরত ফিদায়ে মিল্লাত (রহ.) আঁচ করতে পারেন, এ দেশে গ্রামগঞ্জে যেভাবে হকের প্রচার-প্রসার এবং চর্চায় উলামায়ে কেরামের মেহনতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, শহর ও শহরতলিতে সেরূপ প্রভাব লক্ষ করা যায় না। তিনি উলামায়ে কেরামকে এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনেককে এই ব্যাপারে দিকনির্দেশনাও দেন। তাঁর কথা হলো, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট-বড় ওয়াজ-মাহফিল ও দাওয়াতী কার্যক্রম চলতে থাকুক। তবে সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে স্বতন্ত্র আমেজে বড় বড় শহরে সর্ববৃহৎ গণজমায়েত হওয়া অতীব প্রয়োজন।

তখন চট্টগ্রামে ছিল দেশের শীর্ষ বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখদের সমাগম। যাঁদের প্রায়ই আজ পরলোকগত। হযরত ফিদায়ে মিল্লাত (রহ.)-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মুরব্বিগণের পরামর্শক্রমে চট্টগ্রাম শহরে একটি বড়মাপের ইসলামী সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য হবে সমাজে আহলে হকের পরিচিতি তুলে ধরা এবং সকল বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করা। চট্টগ্রামে সার্কিট হাউস ময়দানে অভূতপূর্ব গণজমায়েতের মধ্য দিয়ে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন' নামে ওই স্বপ্নটি সর্বপ্রথম বাস্তবায়িত হয় ১৯৮৬ সালে। বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরাম ও আওলাদে রাসূল (সা.) এতে অংশগ্রহণ করেন। কয়েক বছর পর এটি স্থানান্তরিত হয় চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে।

উক্ত সম্মেলন কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন জামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক হযরত মাওলানা হাজী ইউনুস (হাজী সাহেব হুজুর) (রহ.)। সেক্রেটারি ছিলেন জামিয়া পটিয়ার বর্তমান মহাপরিচালক হযরত আল্লামা আব্দুল হালীম বোখারী সাহেব। ব্যবস্থাপক ছিলেন জামিয়া পটিয়ার তৎকালীন সহকারী মুহতামিম ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)। এটি ছিল বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন'। কিছুদিন পর হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) সম্মেলন কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ক্রমান্বয়ে তিনি 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' নামে একটি সংস্থার রূপ দিয়ে এ সম্মেলনের বিস্তার ঘটান দেশের বড় বড় জেলা শহরে।

এই সম্মেলন যেমন ইসলামের সঠিক আদর্শ ও হক্কানিয়্যাতের আওয়াজ মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারা, দল এবং ব্যক্তির ব্যাপারেও সচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

বিদ'আত-শিরিকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সম্মেলনের অবদান অভূতপূর্ব। মওদুদীবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করতে এই সম্মেলনের ভূমিকা অনন্য। যার কারণে তারা ছিল এই সম্মেলনের সবচেয়ে ভয়ংকর দুশমন। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সম্মেলনকে বেশির ভাগই বিভিন্ন বাতিল গোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে। তৎকালীন দায়িত্বশীলগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রীতিমতো তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। জাকির নায়েকের সর্বপ্রথম মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে এই সম্মেলনের মাধ্যমে। গাইরে মুকাল্লিদিয়াতের ঈমানবিধ্বংসী চিন্তাধারার মুখোশ খুলে দিতে এই সম্মেলনের অবদান অতুলনীয়। জঙ্গিবাদের ব্যাপারে দেশের মুসলমানদের সর্বপ্রথম সতর্ক করা হয়েছে এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে। কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে যখন যে রূপেই আঘাত এসেছে, এই সম্মেলন তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ইসলাম প্রচারের এই আধুনিক পদ্ধতিকে একটি স্বতন্ত্র আদর্শের গণ্ডিতেই পরিচালনা করতেন আকাবিরগণ। কোনো প্রকার গোনাহ ও মাকরূহ কাজও যেন সংঘটিত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। যেমন ছবি ও ভিডিওর মতো কবীরা গোনাহ থেকে কঠোরভাবে বাধা প্রদান। রাজনীতির প্রতিহিংসা থেকে সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা। অতি পেশাদার আমলহীন ওয়ায়েজ ও দেওবন্দিয়াতের বাইরে কোনো তরীকার বক্তা দাওয়াত না দেওয়া। অতিরিক্ত আলোকসজ্জা থেকে মুক্ত থাকা–এমন যাবতীয় পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকা; যার কারণে সম্মেলনের গতিপথ রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা। এমন কাউকে সম্মান দেখানো, যার কারণে আলেম এবং নববী মেহমান তালেবে ইলমদের ইজ্জত- আবরু খর্ব হয় ইত্যাদি।

হযরত ফিদায়ে মিল্লাত ও অন্যান্য আকাবিরদের রেখে যাওয়া সে আমানত তার নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় আজ ৩২ বছরে উপনীত হলো। আল্লাহর অপার কৃপায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-ঐতিহ্য ও অনন্য আদর্শের ওপর অটুট থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন। মুরব্বিগণ এখন প্রায়ই পরলোকগত। আল্লাহ তাঁদের জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করুন।

এ বছরও কয়েকটি বড় বড় জেলা শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের আশা, আকাবিরদের রেখে যাওয়া এসব আমানত তাঁদের আদর্শ মতেই পরিচালিত হবে। ব্যতিক্রমধর্মী এই সম্মেলনসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে অটুট রেখে সম্মেলনসমূহ সফল করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৭/০১/২০১৬ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٠٩) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٢١٠)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৮) অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২০৯) তারা কি সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ? আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছবে (২১০)। (সূরা বাকারা)

سلم ادخلوا فى السلم كافة শব্দটি যের ও যবর সহযোগে (সিল্ম ও সালম) দুটি পৃথক পৃথক ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 'শান্তি', অপরটি 'ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। –(ইবনে-কাসীর)। كافة শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে এবং সাধারণভাবে' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে ادخلوا (তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করেছে অথবা ইসলাম অর্থে سلم শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে–তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক–সব কিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছে, অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয় কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তা ছাড়া কোরআন ও সুন্নায় বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা, রাষ্ট্র কিংবা রাজনীতির সাথে হোক, বাণিজ্যের সাথে হোক কিংবা শিল্পের সাথে–ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে, তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে ইসলামের বিধানসমূহ তা মানব জীবনের যেকোনো বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধিনিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত পূর্ণ মুসলমানিত্ব অর্জন করতে পারবে না।

এ আয়াতের যে শানেনুজুল ওপরে বলা হয়েছে, মূলত তার মূল বক্তব্য এই যে শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদের অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

সতর্কতা : যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চরণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই ত্রুটি বেশির ভাগ দেখা যায়। এর দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয় এরা যেন এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও যেমন এদের কোনো আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোনো আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ! অন্ততপক্ষে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রচিত 'আদাবে মো'আশিরাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহর আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও বুজুর্গানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সমস্ত গুণাবলি ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৬

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–প্রথম অধ্যায় :

হাদীস নং-০৫

عن حذيفةؓ قال كان رسول الله ﷺ اذا حزبه امر فزع الى الصلوة۔

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মনোনিবেশ করতেন।

(আবু দাউদ শরীফ ১/১৮৭ হা. ১৩১৯, মুসনাদে আহমদ ৫/৩৮৮ হা. ২৩২৯৯, মুসনাদে আবী আওয়ানা ৪/৩২০ হা. ৬৮৪২, তাফসীরে তাবারী ১/২০৫, দালায়েলে নবুওয়াহ [বায়হাকী] ৩/৪৫১, তারীখে বাগদাদ ৬/২৭৪)

হাদীসটির মান : হাসান

ক. হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, যখন ধূলিঝড় শুরু হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদের তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং ঝড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদ হতে বের হতেন না। এমনিভাবে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময়ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযে মনোনিবেশ করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ,ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صَخْرٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ رِيحٍ شَدِيدَةٍ كَانَ مَفْزَعُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْكُنَ الرِّيحُ ,وَإِذَا حَدَثَ فِي السَّمَاءِ حَدَثٌ مِنْ خُسُوفِ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ ,كَانَ مَفْزَعُهُ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يَنْجَلِيَ

(তারীখে ইবনে আসাকির ১৯/১৫২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/২১১, বুখারী শরীফ হা. ১০৪৬)

হাদীসটির মান : হাসান

খ. হযরত সুহাইব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামেরও এই অভ্যাস ছিল যে যেকোনো মুসীবতের সময় তাঁরা নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

عن صهيبؓ قال النبى ﷺ كانوا يعنى الانبياء يفزعون اذا فزعوا الى الصلوة۔

(মুসনাদে আহমদ ৪/৩৩ হা. ১৮৯৩৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১০/৩১৯ হা. ৩০১২২, সুনানে নাসাঈ [কুবরা] ৬/১৫৭ হা. ১০৪৫০, মুসনাদে বাযযার ৬/১৬ হা. ২০৮৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একবার সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে সংবাদ পেলেন যে তাঁর পুত্রের ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে। তিনি উট হতে নেমে দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন, অতঃপর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন এবং বললেন, আমি তাই করছি, যা আল্লাহ তা'আলা করার হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর কোরআনে পাকের আয়াত তেলাওয়াত করলেন : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ :نا هُشيم، نا خَالِدُ بْنُ صَفْوان ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :نُعِي إِلَيْهِ ابْنٌ لَهُ وَهُوَ يَسِيرُ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ :فَعَلْنَا كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ :(اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ)

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৭/১৪ হা. ৯৬৮১, সুনানে সায়ীদ ইবনে মনসূর ৩/৬৩৪ হা. ২৩২)

হাদীসটির মান : হাসান

ঘ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর ভাই কুসামের ইন্তেকালের খবর পেলেন। তখন ইন্না লিল্লাহ... পড়ে রাস্তায় এক পাশে গিয়ে উট হতে নেমে দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন এবং আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দু'আ করতে থাকলেন। তারপর উটে সওয়ার হয়ে কোরআন পাকের আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ (بقره: ٤٥)

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ :نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نُعِيَ إِلَيْهِ أَخُوهُ قُثَمُ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْجُلُوسَ، ثُمَّ قَامَ يَمْشِي إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ يَقُولُ :اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لكبيرة إلا على الخاشعين

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৭/১১৪ হা. ৯৬৮২, সুনানে সাঈদ ইবনে মনসূর ২/৬৩২ হা. ২৩১)

হাদীসটির মান : সহীহ

ঙ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিবিগণের কোনো একজনের ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সিজদায় পড়ে গেলেন। একজন জিজ্ঞাসা করল, এর কারণ কী? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের এটি বলেছেন, যখন তোমরা কোনো দুর্ঘটনা দেখো, তখন সিজদায় মশগুল হয়ে যাও। উম্মুল মুমিনীনের ইন্তেকালের চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আর কী হতে পারে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ :قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ :مَاتَتْ فُلَانَةُ -بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَخَرَّ سَاجِدًا، فَقِيلَ لَهُ :أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا، وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

(আবু দাউদ শরীফ ২/৭০৬ হা. ১১৯৭, তিরমিযী শরীফ ২/২২৭ হা. ৩৮৯১)

হাদীসটির মান : সহীহ

চ. হযরত উবাদা (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় যখন নিকটবর্তী হলো তখন তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ করে বললেন, আমি তোমাদের সকলকে আমার মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করতে নিষেধ করছি। যখন আমার রূহ বের হয়ে যাবে, তখন প্রত্যেকে ওজু করবে এবং আদবের প্রতি লক্ষ রেখে ওজু করবে। অতঃপর মসজিদে যাবে এবং নামায পড়ে আমার জন্য আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফীর দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছেন– واستعينوا بالصبر والصلوة

অতঃপর তোমরা আমাকে কবরে দ্রুত পৌঁছে দেবে।

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ :لَمَّا حَضَرَتْ عُبَادَةَ الْوَفَاةُ، قَالَ " :أَخْرِجُوا فِرَاشِي إِلَى الصَّحْنِ -" يَعْنِي :الدَّارَ -ثُمَّ قَالَ " :اجْمَعُوا إِلَيَّ مَوَالِيَّ، وَخَدَمِي، وَجِيرَانِي، وَمَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَجَمَعُوا لَهُ، فَقَالَ :إِنَّ يَوْمِي هَذَا لَا أُرَاهُ إِلَّا آخِرَ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الْآخِرَةِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ فَرَطَ مِنِّي إِلَيْكُمْ بِيَدِي أَوْ بِلِسَانِي شَيْءٌ، وَهُوَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْقَصَاصُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأُحَرِّجُ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اقْتَصَّ مِنِّي قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ نَفْسِي "، قَالَ :فَقَالُوا :بَلْ كُنْتَ وَالِدًا، وَكُنْتَ مُؤَدِّبًا، قَالَ :وَمَا قَالَ لِخَادِمٍ سُوءًا قَطُّ .فَقَالَ " :أَغْفَرْتُمْ لِي مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ "، قَالُوا :نَعَمْ .قَالَ " :اللهُمَّ اشْهَدْ ." فَقَالَ " :أَمَّا لِي فَاحْفَظُوا وَصِيَّتِي، أُحَرِّجُ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْكُمْ يَبْكِي، فَإِذَا أُخْرِجَتْ نَفْسِي فَتَوَضَّئُوا وَأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ، ثُمَّ لِيَدْخُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَسْجِدًا فَيُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِعُبَادَةَ وَلِنَفْسِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ :(اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) (البقرة١٥٣ :)، ثُمَّ أَسْرِعُوا بِي إِلَى حُفْرَتِي، وَلَا تَتْبَعْنِي نَارٌ، وَلَا تَضَعُوا تَحْتِي أُرْجُوانًا

(শু'আবুল ঈমান ৭/১১৪ হা. ৯৬৮৩)

হাদীসটির মান : হাসান

ছ. হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর স্বামী হযরত আব্দুর রহমান (রা.) অসুস্থ ছিলেন। একবার তিনি এমনই বেহুঁশ হয়ে পড়লেন যে সকলেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে বলে সাব্যস্ত করল। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) উঠলেন এবং নামাযের নিয়্যাত বাধলেন। তিনি নামায হতে ফারেগ হলে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হুঁশ ফিরে পেলেন। লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, আমার অবস্থা কি মৃত্যুর মতো হয়ে গিয়েছিল? লোকেরা আরজ করল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, দুজন ফেরেশতা আমার নিকট এলেন এবং বললেন, চলো আহকামুল হাকেমীনের দরবারে তোমার ফয়সালা হবে। এই কথা বলে

তাঁরা আমাকে নিয়ে যেতে লাগলেন। এমন সময় তৃতীয় একজন ফেরেশতা আগমন করলেন এবং সেই দুজনকে বললেন, তোমরা চলে যাও, ইনি ওই সমস্ত লোকের মধ্যে একজন, যাঁদের তাকদীরে সৌভাগ্য ওই সময়ই লেখে দেওয়া হয়েছে, যখন তাঁরা মায়ের পেটে ছিলেন। এখনও তাঁর দ্বারা তাঁর সন্তানগণের আরও অনেক উপকার হাসিল করা বাকি থেকে গেছে। এরপর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) এক মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতঃপর ইন্তেকাল করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ :حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ غُشِيَ عَلَيْهِ غَشْيَةً ظَنُّوا أَنَّ نَفْسَهُ فِيهَا، فَخَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ تَسْتَعِينُ بِمَا أُمِرَتْ أَنْ تَسْتَعِينَ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ :أَغُشِيَ عَلَيَّ؟ قَالُوا :نَعَمْ، قَالَ :صَدَقْتُمْ، إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكَانِ فِي غَشْيَتِي هَذِهِ فَقَالَا :أَلَا تَنْطَلِقُ فَنُحَاكِمَكَ إِلَى الْعَزِيزِ الْأَمِينِ؟ فَقَالَ مَلَكٌ آخَرُ :أَرْجِعَاهُ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّنْ كُتِبَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ وَهُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَسَيُمَتِّعُ اللَّهُ بِهِ بَنِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ :فَعَاشَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَ "

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১১/১১২ হা. ২০০৬৫, শু'আবুল ঈমান ৭/১১৫ হা. ৯৬৮৪)

হাদীসটির মান : সহীহ

জ. হযরত নযর (রা.) বলেন, একবার দিনের বেলায় ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল। আমি দৌড়ে হযরত আনাস (রা.)-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জমানায় কখনও কি এরূপ অবস্থা হয়েছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর পানাহ! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় তো সামান্য জোরে বাতাস বইলে আমরা মসজিদে দৌড়ে যেতাম আর মনে করতাম না জানি কিয়ামত এসে গেল।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ، ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ :كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ :يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :مَعَاذَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ الرِّيحُ لَيَشْتَدُّ فَيُبَادِرُ إِلَى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَدِ احْتَجَّا بِالنَّضْرِ

(মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৮৩ হা.১২৪১, আবু দাউদ শরীফ ১/৭০৬ হা. ১১৯৬, শু'আবুল ঈমান ২/৩১২ হা. ৯৬৫, সুনানে কুবরা ৩/৪৭৭ হা. ৬৩৭৮)

হাদীসটির মান : হাসান

ঝ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরওয়ালাদের ওপর কোনো রকম অভাব-অনটন দেখা দিত, তখন তাদের নামাযের হুকুম করতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করতে বলতেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا

অর্থ : হে রাসূল! আপনা ঘরওয়ালাদেরকে নামাযের হুকুম করতে থাকুন এবং নিজেও এর এহতেমাম করুন। আপনাকে রুজি উপার্জনে লাগাতে চাই না; রুজি তো আপনাকে আমিই দেব। (সূরা ত্বাহা ১৩২)

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ حَاضِرٌ أبنا أَبُو نُعَيْمٍ أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ الضِّيقُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلاةِ ثُمَّ قَرَأَ (وَأمر أهلك بِالصَّلَاةِ واصطبر عَلَيْهَا) الآيَةَ

(আল মু'জামুল আওসাত [তাবারানী] ১/৩৬৫ হা. ৮৯০, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/১৫৩ হা. ৩১৮০, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/৪৯ হা. ৪৭৪৪, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৭৬)

হাদীসটির মান : হাসান

ঞ.

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন কারও কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তা দ্বীনি প্রয়োজন হোক বা দুনিয়াবী, এর সম্পর্ক আল্লাহর তা'আলার সাথে হোক বা কোনো মানুষের–তার উচিত যেন সে ভালো করে ওজু করে, অতঃপর দুই রাক'আত নামায আদায় করে। তারপর আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করে এবং দরূদ শরীফ পড়ে। অতঃপর নিম্নবর্ণিত দু'আ করে–ইনশাআল্লাহ তার প্রয়োজন নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

:لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ

وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيَقُلْ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي، ثُمَّ لِيَسْأَلْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ."

(তিরমিযী শরীফ ১/১০৮ হা. ৪৭৯, ইবনে মাজা শরীফ ১/৯৮ হা. ১৩৮৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩২০ হা. ১১৯৯)
হাদীসটির মান : হাসান লি গাইরিহী

الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي، ثُمَّ لِيَسْأَلْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَ" :مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

DOLPHIN BANGLADESH

Quality is our first priority

Car Importer,Whole Seller & Retailer

Contact : Ka-82, Kuril Bishwa Road, Dhaka- 1229
Phone : 8413917, 8413918 Cell : 01713-120426
Email : dolphinbd@agni.com

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

দরসে ফিক্বহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-১০

মুফতী শাহেদ রহমানী

ইযার বা লুঙ্গি পরিধানের বিধান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আরব দেশের সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক ছিল 'ইযার ও রিদা'। একটি চাদরে শরীরের নিম্নাংশে জড়ানো হতো ও একটি চাদর শরীরের ওপরাংশে কাঁধের ওপর জড়ানো হতো। বর্তমান যুগে এ প্রাচীন আরবীয় পোশাক প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। শুধু হজের সময় আমরা এ পোশাক দেখতে পাই। হজের সময় পুরুষ হাজীগণ শরীরের নিম্নাংশে যে চাদর বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধান করেন তাকে ইযার বলা হয়। সাধারণভাবে আমরা ইযার বলতে সেলাইবিহীন লুঙ্গি বা খোলা লুঙ্গি বলতে পারি।

মহানবী (সা.) বিভিন্ন পোশাক পরিধান করতেন। তিনি জামা (কামিস) পছন্দ করতেন। তবে অগণিত হাদীসের আলোকে দেখা যায়, ব্যবহারের আধিক্যের দিক থেকে ইযার ও রিদা বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদরই তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতেন।

লুঙ্গির আয়তন

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইযার বা লুঙ্গি পরিধানের কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত ইযারের আয়তন সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাগুলোর সনদ দুর্বল। তবে সব বর্ণনা একত্র করা হলে সেখান থেকে আমরা বিশেষ বিধান পাই।

ওয়াকিদী (রহ.) যয়ীফ সনদে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লুঙ্গি ছিল চার হাত এক বিঘত লম্বা ও এক হাত এক বিঘত চওড়া। তিনি জুমু'আ ও দুই ঈদের নামাযের জন্য তা পরিধান করতেন।' এতে প্রতীয়মান হয় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীগণের ব্যবহৃত লুঙ্গি আমাদের লুঙ্গির মতোই বা তার চেয়ে একটু কম লম্বা ছিল এবং আমাদের দেশে প্রচলিত লুঙ্গির চেয়ে অনেক কম চওড়া ছিল।

ইযার বা লুঙ্গি পরিধানের পদ্ধতি

মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন,

رأيت عمر -رضى الله عنه -يأتزر فوق سرته .

'আমি ওমর (রা)-কে দেখেছি তিনি নাভির ওপরে লুঙ্গি পরিধান করেছেন। আলী (রা.) নাভির ওপরে লুঙ্গি বাঁধতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো সাহাবী ও তাবিঈ নাভির নিচে লুঙ্গি পরিধান করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। (আল জামেউস সহীহ লিস সুনানে ওয়াল মাসানীদ)

তবে মনে রাখতে হবে যে কিছুতেই টাখনুর নিচে লুঙ্গি পরিধান করা যাবে না। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লুঙ্গির নিম্ন প্রান্ত 'নিসফ সাক' বা পায়ের নলার মাঝামাঝি থাকত। সাহাবীগণ তাঁর অনুকরণে লুঙ্গি পরিধান করতেন। উসমান (রা.) গোড়ালি ও হাঁটুর মাঝামাঝি (নিসফুস সাক) পর্যন্ত ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধান করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে লুঙ্গি পরিধান করতেন। আর ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর সামনের দিক থেকে লুঙ্গির প্রান্ত নামিয়ে দিতেন, যাতে লুঙ্গির প্রান্ত পায়ের ওপর পড়ে যেত আর পেছন থেকে তা উঠিয়ে উঁচু করে পরতেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এভাবে লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি।

এখানে লক্ষণীয় যে সাধারণভাবে লুঙ্গির সঙ্গে চাদর পরাই ছিল আরবদের সাধারণ পোশাক। এ জন্য লুঙ্গির দায়িত্ব ছিল শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করা। তবে পোশাকের স্বল্পতার কারণে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং অনেক সময় সাহাবীগণ একটিমাত্র ইযার বা লুঙ্গি পরিধান করেই চলাফেরা করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ইযার দিয়েই শরীরের উপরিভাগের কিছু অংশ আবৃত করার চেষ্টা করতেন। ফলে 'ইযার'-এর পরিধান পদ্ধতি ও তার উপরিভাগ ও নিম্ন প্রান্ত অবস্থানে কিছু হেরফের হতো। ইযার ছোট হলে তাঁরা ওপরে বর্ণিত নিয়মে কোমরে ইযার বাঁধতেন এবং শরীরের উপরিভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত রেখে চলাফেরা করতেন। আর ইযারের প্রস্থ বা আকার একটু বড় হলে তা তাঁরা কাঁধের ওপর দিয়ে জড়িয়ে পরতেন। তাতে একটি ইযারেই তাঁদের কাঁধ থেকে

হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত আবৃত হয়ে যেত।

ইযার বা লুঙ্গির রং

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন রঙের ইযার পরিধান করেছেন। লাল, কালো, সাদা, সবুজ, হলুদ ও ডোরাকাটা বা মিশ্রিত রঙের ইযার তিনি পরিধান করেছেন।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে লুঙ্গির ব্যবহার

ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারে লুঙ্গির প্রচলন দেখা যায়। যদিও উপমহাদেশে লুঙ্গির সূচনা দক্ষিণ ভারতে, কিন্তু এটি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জাতিই ব্যবহার করে থাকে। যদিও এক রঙের লুঙ্গিই বেশি জনপ্রিয়, কিন্তু সাধারণত এটি বিভিন্ন নকশা ও রঙে সুতায় বোনা হয়। নকশা ও রং ছাড়াও লুঙ্গির ওপরে ও নিচে সাদা বা কালো রঙের ডোরাকাটা দাগ থাকে। ধুতি বা চাদরের মতো হলেও লুঙ্গি স্কার্টের মতো করে গোল করে সিলানো থাকে। দৈনন্দিন পরিধান করার ক্ষেত্রে লুঙ্গি সাধারণত দুই গেড়ো বাঁধন বেশি জনপ্রিয়। কারণ এতে লুঙ্গি খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। লুঙ্গি সাধারণত নিজের স্বস্তি ও রুচি অনুযায়ী পরা হয়। বিশেষভাবে যেসব অঞ্চলে গরম ও আর্দ্রতার কারণে আবহাওয়া অসহনীয় হয়ে ওঠে, সেসব অঞ্চলে এটি পরা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, উপমহাদেশে লুঙ্গির সূচনা হয়েছে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে। ভেস্তি নামক এক ধরনের পোশাককে লুঙ্গির পূর্বসূরি বলে মনে করা হয়। 'বারাদাভারগাল' নামের তামিলনাড়ুর জেলে জাতি পশ্চিম আফ্রিকা, ইজিপ্ট বা মিসর ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে লুঙ্গি রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সময়ের সঙ্গে সাদা কাপড়ে ফুল ও অন্যান্য নকশা চিত্রিত হয়ে পরবর্তীতে লুঙ্গিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে লুঙ্গি মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোয় বেশি জনপ্রিয়।

লুঙ্গি সাধারণত বাংলাদেশি সব জাতির পুরুষদেরই পরতে দেখা যায়, যদিও এটি কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান বা দিনে পরা হয় না। বাংলাদেশে লুঙ্গি বেশির ভাগ পুরুষই দৈনন্দিন নিত্য ব্যবহার্য পোশাক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। যদিও সুতায় নকশা করা, বাটিক করা বা সিল্কের লুঙ্গি কখনো কখনো বিয়ের উপহার হিসেবে বরকে দেওয়া হয়। কোনো বিশেষ দিন উপলক্ষে শিক্ষক ও মসজিদের ইমামদের লুঙ্গি উপহারের রীতি এখনো চালু আছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় মহিলারা একই পোশাক পরিধান করেন, বাঙালি মহিলারা লুঙ্গি পরিধান করেন না। উপজাতীয়দের কাছে এ পোশাক থামি নামে পরিচিত। প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পুরুষের দৈনন্দিন পোশাক হিসেবে ধুতির পরিবর্তে লুঙ্গির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো কোনো বাঙালি লুঙ্গি পরে না, কারণ তারা মনে করে লুঙ্গি খুবই অনানুষ্ঠানিক ও মানানসই নয়, যদিও এটি আরামদায়ক এবং অনেকেই ব্যবহার করছে। এটি এখনো বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রাম্য পুরুষের পরিচ্ছদ পোশাক।

কেরালায় লুঙ্গি পুরুষ ও মহিলা উভয়েই পরে থাকে। এটিকে খুবই অনানুষ্ঠানিক এবং দিনমজুরদের পোশাক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে লুঙ্গি সাধারণত রঙিন এবং বিভিন্ন নকশা করা থাকে। সাদা রঙের নকশা ছাড়া লুঙ্গির সংস্করণকে মুড়ু নামে ডাকা হয়। কোনো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মুড়ুতে কখনো কখনো সোনালি সুতায় এমব্রয়ডারি করা থাকে, যা কাসাভু নামে পরিচিত। লুঙ্গি সাধারণত বিয়ে বা অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরা হয় না। লুঙ্গির মতো সাদা রঙের নকশা ছাড়া দুই ভাঁজের কাপড়কে ডাকা হয় পাঞ্চে বলে। পাঞ্চে যা লুঙ্গির বিপরীত পরা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহে। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশেও এগুলো ব্যবহার করা হয়।

তামিলনাড়ুতে শুধু পুরুষেরা লুঙ্গি পরিধান করে এবং কেরালার লোকদের মতো করেই ব্যবহার করে। দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে এটি কাইলি অথবা সারং/চারাং বলে ডাকা হয়।

মিয়ানমারে বার্মিজ ভাষায় লুঙ্গিকে লোঙ্গাই বলে ডাকা হয়। পুরুষের জন্য এটি ঘরের কাজ থেকে জীবনের সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। সাধারণত শুধু সৈনিকগণ পায়জামা পরে এবং যে সকল যুবক পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় মত্ত তারা বাড়িতে লোঙ্গাই পরে থাকে। মহিলাদের জন্য এটি তামাইন হিসেবে পরিচিত, যা খুবই জনপ্রিয়। বিভিন্ন সুতায় বোনা যেমন সুতি এবং সিল্কের লুঙ্গি বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক সময়ে পরিধান করা হয়।

ইয়েমেনে এ ধরনের পোশাককে মা'আউইস বলে ডাকা হয় এবং সব বয়সের পুরষই এ পোশাক পরিধান করে।

সোমালিয়ায় মা'আউইসের হুস গুনতি পুরুষদের পরিধেয়। এটি বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই বেশি পরে থাকে। এটি সাধারণত অনেক সোমালীয় পরিধান করে, যখন বাড়িতে অবসর সময় কাটায়। এ পোশাকের ঐতিহ্যবাহী রং হচ্ছে সাদা নকশা ছাড়া, কিন্তু এশিয়ার প্রভাবে এবং সোমালিয়ায় মসলা রপ্তানির পথিমধ্যে হওয়ায় এশিয়া বণিকদের

ব্যবহৃত রঙিন লুঙ্গির সাথে এ দেশের মানুষের পরিচয় ঘটে। (সূত্র : দৈনিক যায়যায়দিন : ৭ জুন, ২০১২)

বাংলাদেশ লুঙ্গি 'ম্যানুফ্যাকচারাস, এক্সপোর্টার্স অ্যান্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দেশের প্রায় চার কোটি লোক লুঙ্গি পরে। প্রতিজন দুটি করে লুঙ্গি পরলেও তাহলে বার্ষিক চাহিদা প্রায় আট কোটি পিস, যার বাজার মূল্য প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। লুঙ্গি বাংলাদেশে একটি অনানুষ্ঠানিক পোশাক হিসেবে দেশে প্রচলিত। অন্যান্য অনেক দেশে সুতা ও জরির কাজ করা লুঙ্গি অনুষ্ঠানেও পরা হয়। তবে বাংলাদেশে পুরান ঢাকাসহ অনেক এলাকার লুঙ্গিপ্রিয় মানুষ সব অনুষ্ঠানে লুঙ্গি পরে যেতে অস্বস্তি বোধ করে না। এমনকি অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও ঘরোয়া পরিবেশে লুঙ্গি পরিধান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

গবেষক গোলাম মুরশিদ তাঁর 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' বইতে লিখেছেন, 'উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই ইংরেজি-শিক্ষিতদের মধ্যে পশ্চিমা পোশাক অথবা সে পোশাকের কিছু উপকরণ অনুপ্রবেশ করেছিল। তবে বৃহত্তর বাঙালি সমাজে বহাল থাকে সনাতনী পোশাক।'

গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, 'বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম-পরিচালিত পত্রপত্রিকায় শিক্ষিত মুসলমানদের ধুতি পরার সমালোচনা করা হয়েছে। তখন ওই সব পত্রপত্রিকার নিবন্ধে ধুতির বদলে পাজামা পরার অনুরোধ জানানো হয়। গ্রামের মুসলমানরা অবশ্য আগে থেকেই ধুতির বদলে লুঙ্গি পরতে শুরু করে। দেশ ভাগের পর দ্রুত পূর্ববাংলায় পুরুষদের পরনে ধুতির জায়গা দখল করে নেয় লুঙ্গি।'

রিদা বা চাদর

রিদা অর্থ চাদর জাতীয় কাপড়, যা শরীরের ঊর্ধ্বাংশে জড়ানো হয়। সাধারণভাবে লুঙ্গির সঙ্গে রিদা বা চাদর পরিধান করাই ছিল আরব দেশের সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক। সাধারণভাবে ইযার ও রিদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই ধরনের দুটি 'থান' কাপড়।

নিম্নাংঙ্গে পরিধান করা হলে তাকে ইযার বলা হয়। আর ঊর্ধ্বাংঙ্গে পরিধান করা হলে তাকে রিদা বলা হয়। এ অর্থে আরো অনেক শব্দ হাদীস শরীফে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত এসব চাদর দিয়ে সরাসরি শরীর আবৃত করা হতো। কখনো এগুলোকে অন্য কোনো পোশাকের ওপরও পরিধান করা হতো। এসব চাদরের আকৃতি, রং, তৈরির উপাদান ইত্যাদির কারণে এর আরবী নামেরও পার্থক্য আছে।

চাদরের আয়তন

ইমাম ওয়াকিদি (রহ.) বর্ণনা করেছেন,

وذكر الواقدى .أن بردة النبى صلى الله عليه وسلم كانت طول ستة أذرع فى ثلاثة وشبر ، وإزاره من نسج عمان ، طوله أربعة أذرع وشبر فى ذراعين وشبر ، كان يلبسهما يوم الجمعة والعيدين ثم يطويان .حديث معضل . وقال عروة :إن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان يخرج فيه إلى الوفد رداء حضرمى طوله أربعة أذرع ، وعرضه ذراعان وشبر ، فهو عند الخلفاء قد خلق ، فطروه بثوب ، يلبسونه يوم الأضحى والفطر .رواه ابن المبارك

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিদা বা চাদরের দৈর্ঘ্য ছিল ছয় হাত এবং প্রস্থ ছিল তিন হাত।

অন্য বর্ণনায় উরওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে চাদর পরিধান করে বিশেষ মেহমান ও আগন্তুকদের সামনে আসতেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল চার হাত এবং প্রস্থ ছিল দুই হাত ও এক বিঘত। এ চাদরটি এখনো (উমাইয়া যুগে, হিজরী প্রথম শতকের শেষ দিকে) খলীফাদের কাছে রয়েছে। তা পুরনো হয়ে গিয়েছে। এ জন্য তাঁরা অন্য কাপড় দিয়ে তা জড়িয়ে নিয়েছেন। তাঁরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে তা পরিধান করেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাপড়ের দৈর্ঘ্য ছিল চার হাত ও এক বিঘত এবং প্রস্থ ছিল এক হাত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চতুর্ভুজ সমান দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের চাদর পরিধান করতেন। মোটকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৪ থেকে ৬ হাত দৈর্ঘ্য ও দেড় থেকে তিন হাত প্রস্থ চাদর পরিধান করতেন।

রিদা বা চাদর পরিধান করার পদ্ধতি

চাদর পরিধানের বিষয়ে আমরা স্বভাবতই বুঝতে পারি যে কাঁধের ওপর রেখে দুই প্রান্ত দুই দিকে বা একদিকে রেখে চাদর পরা হয়। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন সময়ে শরীরে পেঁচিয়ে চাদর পরিধান করতেন। কখনো বা বাম কাঁধের ওপর চাদর রেখে ডান কাঁধ খোলা রেখে বগলের নিচে দিয়ে পেঁচিয়ে চাদর পরিধান করতেন।

সাধারণভাবে চাদর মাথা আবৃত করার জন্য ব্যবহার করা হয় না। তবে কখনো কখনো তিনি চাদর বা চাদরের প্রান্ত দিয়ে মাথা আবৃত করতেন বা চাদরকে মাথার ওপর রুমাল হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়।

আল্লামা ইবনে ইউসুফ শামী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসতিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নাযাজে নিজের শরীরের চাদর ঘুরিয়ে নেন। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি চাদর পরতেন মাথার ওপর দিয়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি মাথা ও দুই কাঁধের ওপর চাদর ফেলে রাখতেন, তা জড়িয়ে নিতেন না।

লুঙ্গি ও চাদর বিষয়ক হাদীসগুলো থেকে জানা যায়–

ক. সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদর আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পোশাক ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এটি ব্যবহার করতেন।

খ. এ পোশাকই ছিল সবচেয়ে সাধারণ ও স্বাভাবিক পোশাক। এ জন্য হজের সময় স্বাভাবিকতা ও সাজগোজহীনতা প্রকাশের জন্য এ পোশাক পরিধান করা হতো।

গ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রঙের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেছেন। কালো, সবুজ, সাদা, লাল, হলুদ ও মিশ্রিত ডোরাকাটা রঙের চাদর ও লুঙ্গি তিনি পরিধান করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। এগুলোর মধ্যে সবুজ বা মিশ্রিত রং তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং সাদা রঙের পোশাক পরতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ডোরাকাটা রঙের পোশাক তিনি পছন্দ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত কম দামের ৫ থেকে ৭ দিরহামের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেছেন। আবার অত্যন্ত দামি ৩০০০ দিরহামের লুঙ্গিও চাদরও পরিধান করেছেন। এ ক্ষেত্রের তাঁর সাধারণ রীতি ছিল সাধারণভাবে সহজলভ্য ও বিলাসিতামুক্ত পোশাক পরিধান করা। কেউ দামি পোশাক হাদিয়া দিলে তা ফিরিয়ে না দিয়ে তা প্রয়োজনমতো তিনি ব্যবহার করতেন।

ঙ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বাভাবিকভাবেই সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতেন। লুঙ্গি কোমরে নাভির ওপরে বাঁধতেন। নিম্ন প্রান্ত হাঁটুর কিছু নিচে বা পায়ের গোড়ালি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানে থাকত। তবে সামনের অংশ বা দুই প্রান্ত সাধারণভাবে নিচে ঝুলে যেত। চাদর স্বাভাবিকভাবে কাঁধের ওপর দিয়ে গায়ে জড়াতেন। মাথার ওপর দিয়েও পরিধান করতেন বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন। তবে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো হাদীস নেই।

তাই এ ক্ষেত্রে মানুষের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা রয়েছে। প্রত্যেকে নিজেদের অভিরুচি ও পছন্দ মতো রঙের লুঙ্গি পরিধান করতে পারবে। তবে তা যেন কিছুতেই টাখনুর নিচে পড়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পাজামা পরিধানের বিধান

পাজামাকে আরবিতে 'সারাবীল' বা 'সিরওয়াল' বলা হয়। শব্দটি মূলত ফারসি ভাষা থেকে গৃহীত। শাব্দিকভাবে 'সিরওয়াল' বা 'সারাবীল' বলতে সালোয়ার, পাজামা বা প্যান্ট জাতীয় ইত্যাদি পোশাক বোঝানো হয়, যেগুলো শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয় এবং দুই পা পৃথকভাবে আবৃত করা হয়। ইংরেজিতে (trousers, pants, panties)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে লুঙ্গির চেয়ে পাজামার ব্যবহার কম ছিল।

জাহেলি যুগ থেকেই পাজামা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত ছিল। নাম থেকে অনুমান করা হয় যে, 'সারাবীল" বা পাজামার ব্যবহার পারস্য ও অন্যান্য জাতি থেকে আরবদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। এ জন্য কোনো কোনো সাহাবী পাজামার পরিবর্তে আরবীয় 'ইযার' বা খোলা লুঙ্গি পরিধান করাকে উত্তম মনে করতেন এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে হযরত ওমর (রা)-এর মতামতসম্বলিত একটি হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। সেখানে লুঙ্গি পরিধানে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

এ থেকে মনে হয়, পাজামার ব্যবহার আরবদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও তাঁদের কেউ কেউ পাজামার চেয়ে ইযার বা লুঙ্গির ব্যবহার বেশি পছন্দ করতেন। এমনকি কোনো কোনো সাহাবী জীবনে কখনো পাজামা পরেননি বলে জানা যায়। খলীফা উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর খাদেম আবূ সাঈদ মুসলিম তাঁর শাহাদাতের দিনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

عن مسلم أبى سعيد مولى عثمان بن عفان :أن عثمان بن عفان أعتق عشرين مملوكا، ودعا بسراويل فشدها عليه، ولم يلبسها فى جاهلية ولا إسلام، وقال :إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة فى المنام، ورأيت أبا بكر وعمر، وإنهم قالوا لى : اصبر، فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم دعا

بمصحف فنشره بين يديه، فقتل وهو بين يديه.

'তিনি ২০ জন ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করেন। একটি পাজামা চেয়ে নেন এবং মজবুত করে তা পরিধান করেন। তিনি তাঁর জীবনে, ইসলাম গ্রহণের আগে বা পরে কখনো সালোয়ার বা পাজামা পরেননি। (নিহত হলে মৃতদেহের সতর অনাবৃত হতে পারে ভয়ে তিনি পাজামা পরিধান করেন।) তিনি বলেন, গত রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রা) ও ওমর (রা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁরা বলেছেন, তুমি ধৈর্যধারণ করো। আগামীকাল তুমি আমাদের সঙ্গে সকালের খাবার গ্রহণ করবে। এরপর তিনি কোরআনে কারীম চেয়ে নিয়ে খুলে পড়তে শুরু করেন। কোরআনের সামনেই তাঁকে শহীদ করা হয়।'
(মুসনাদে আহমদ হা. ৫২৬)

অন্যদিকে সাহাবী-তাবেঈগণের কেউ কেউ পাজামাকে বেশি পছন্দ করতেন, কারণ তা সতর আবৃত করার জন্য বেশি উপযোগী।

পাজামা পরিধানের চেয়ে লুঙ্গি পরিধান প্রচলিত থাকার অর্থ এ নয় যে পাজামার ব্যবহার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে ছিল না বা এটি অপছন্দনীয় ছিল। বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীগণের যুগে পাজামার প্রচলন ছিল। তবে তা লুঙ্গির চেয়ে কম ব্যবহৃত হতো। সে সময় শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য ইযারই ছিল প্রধান পোশাক। তবে তার পাশাপাশি পাজামা বা সালোয়ারের ব্যবহার সুপরিচিত ছিল। হাদীস শরীফে অগণিত স্থানে 'সারাবীল' বা পাজামার উল্লেখ আছে। হজের সময় হজ পালনকারী পুরুষ ও নারী কী ধরনের পোশাক পরিধান করবেন ও কী ধরনের পোশাক পরিধান করবেন না, সে বিষয়ক অনেক সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়েছে। এসব হাদীসে বলা হয়েছে, হজ বা ওমরাহর ইহরামকারী পুরুষ পাজামা পরিধান করবে না। আর নারীরা ইহরাম অবস্থায় পাজামা পরিধান করতে পারবে। এসব হাদীস সে যুগে পাজামার ব্যাপক প্রচলন থাকার প্রমাণ বহন করে। একটি হাদীসে পাজামার ওপর চাদর পরিধান না করে শুধু পাজামা পরে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকেও বোঝা যায়, পাজামার প্রচলন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমসাময়িক আরবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছিল। এমনকি শুধু পাজামা পরিধান করে চলাফেরার অভ্যাস ছিল তাদের। এ জন্য তিনি শুধু পাজামা পরিধান করে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পাজামা ক্রয়

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাজামা ক্রয় করেছেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুওয়াইদ ইবনে কাইস (রা.) বলেন,

جلبت أنا ومخرفة العبدى بزا من هجر، فجاء نا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم :يا وزان زن وأرجح

'আমি ও মাখরাফা আবদী দুজনে কিছু কাপড় নিয়ে বিক্রয়ের জন্য মক্কায় এসেছিলাম। (হজ মৌসুমে আমরা যখন মিনায় ছিলাম তখন) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে আগমন করেন এবং একটি পাজামা দামদর করে ক্রয় করেন। আমাদের কাছে একজন ওজনদার মূল্য হিসেবে প্রদত্ত দ্রব্য ওজন করে বুঝে নিচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন, সঠিকভাবে ওজন করো এবং বাড়িয়ে দাও। (তিনি পাজামাটির মূল্য হিসেবে প্রদত্ত দ্রব্য নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে একটি বেশি দেন।) অন্য বর্ণনায় সুওয়াইদ বলেন, হিজরতের আগেই আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একটি পাজামা বিক্রয় করেছিলাম।' (ইবনে মাজাহ হা. ২২২০)

ওপরের হাদীস থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে পাজামা পরিধান করতেন এবং নিজের ব্যবহারের জন্যই তিনি তা ক্রয় করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। তিনি পাজামা পরেছেন বলে একটি দুর্বল বর্ণনা পাওয়া যায়। হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পাজামা ক্রয় করতে দেখে তাঁকে প্রশ্ন করেন যে তিনি পাজামা পরিধান করেন কি না। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

أجل فى السفر والحضر، وبالليل والنهار فإنى أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه

'হ্যাঁ, বাড়িতে অবস্থানের সময় ও সফরের সময়, রাতে এবং দিনে (সর্বদা আমি পাজামা পরিধান করি); কারণ আমাকে সতর আবৃত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাজামার চেয়ে ভালো আবরণ আমি আর পাইনি।' (তাবারানী আওসাত, হাদীস : ৬৫৯৪)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

একজন থেকেই উপকৃত হওয়া :

কিছু লোক আছে, যারা একাধিক বুজুর্গের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সকলের কাছ থেকে সবক হাসিলের দরখাস্ত করে। একজনের দীক্ষা সম্পর্কে আরেকজনকে বলে না। ফলে তার জিন্দেগী খতম হয়ে যায়; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। যেমন একজন রোগী কয়েক ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করে। একজনের প্রেসক্রিপশন অন্যজন থেকে গোপন রাখে। তাহলে সে লোক কিভাবে সুস্থ হবে? বরং এতে তার জীবনের ঝুঁকি আছে। মানুষের উচিত হলো, একজনকে ধরে রাখা। ধৈর্যের সাথে চিকিৎসা করানো। নিজের অবস্থা সম্পর্কে তাকে জানানো এবং তার নির্বাচিত বিষয়গুলোর পাবন্দী করা। ইনশাআল্লাহ তাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কামিয়াব করবেন।

এক নির্লজ্জ নিজের মেয়েকে দুই ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিল। উভয় স্বামীকেই বলল, ছয় মাস তোমার কাছে থাকবে আর ছয় মাস আমার ঘরে থাকবে। এক স্বামী তার স্ত্রীর জন্য একটি উন্নতমানের শাল খরিদ করে আনলেন। একদা ওই স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যাওয়ার সময় ওই শালটিও নিয়ে গেলেন। স্বামী এক দিন নিজে ওই শাল আউড়িয়ে কোনো বৈঠকে যোগ দিলেন। ওই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন আরেক স্বামীও। তিনি শালটি দেখে চিন্তা করলেন এটি আমার কেনা শাল। এই ব্যক্তির হাতে কিভাবে এল? বিষয়টি কোনোভাবে তিনি মেলাতে পারছিলেন না। মনে মনে একটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আঁটলেন। ওই লোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– ভাই, এই শাল তো বড়ই সুন্দর, খুবই উন্নত। কোত্থেকে খরিদ করেছেন। আমাকে একটু জানাবেন? আমিও একটি শাল খরিদ করতে ইচ্ছুক। উত্তরে তিনি বললেন, এটি আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রাপ্ত। বললেন, আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায়? তিনি বললেন, আমার শ্বশুরবাড়ি ওই স্থানে। এই লোকের অন্তরে সন্দেহ ও সংশয় আরো বৃদ্ধি পেতে থাকল। বললেন, মেহেরবানি করে আমাকেও সাথে নিয়ে যাবেন। এর সাথে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া হলো। উভয়ে এখন অবগত হলেন তাঁদের শ্বশুরবাড়িও এক, এমনকি স্ত্রীও এক। উভয়ে শ্বশুর এবং স্ত্রীকে খুব ঘৃণা করলেন এবং প্রতিবাদ করতে লাগলেন।

দেখুন ভাইয়েরা, হারজায়ীদের এই অবস্থাই হয়ে থাকে। পদে পদে তাদের অপমানিত হতে হয়। এক পথেরই যাত্রী হওয়া চাই। এর মধ্যে মানুষের কামিয়াবী এবং সফলতা। হযরত খাজা সাহেব বলেন–

میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے
سر زاہد نہیں یہ سر، سر سودائی ہے۔

আল্লাহ ওয়ালাদের শান :

আল্লাহ ওয়ালারা সব সময় আল্লাহর হুকুমকৃত বিষয় পালন এবং নিষেধকৃত বস্তু থেকে বেঁচে থাকার ফিকিরে মশগুল থাকেন। ইবাদতসমূহ সুন্দর থেকে সুন্দর পদ্ধতিতে পালন করার চেষ্টা করেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে তাঁরা কাতর থাকেন। সব সময় সব কাজের পর চিন্তা করেন–না জানি এই আমলে কোনো ভুলত্রুটি হয়ে গেছে। যার কারণে আমাকে জবাবদিহি করতে হতে পারে।

যেমন একজন ব্রিলিয়ান্ট মেধাবী ছাত্র সব সময় মেহনতে লিপ্ত থাকে। পরীক্ষায় খুব উন্নত ভাষা ও লেখা দ্বারা উত্তরপত্র তৈরি করে। নিজের যতটুকু মেধা খাটানো প্রয়োজন সর্বশক্তি নিয়োগ করে উত্তরপত্র লেখে। এরপর আবার অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে সেটা পাঠ করে দেখে। তার পরই উত্তরপত্র জমা দেয়। এত গুরুত্ব এবং এত সুন্দর লেখার পরও ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তার অন্তরে একটা ভীতি কাজ করে। চিন্তা করে পরীক্ষকের চাহিদার বিপরীত কিছু হয়ে গেছে কি না? কোনো শব্দ ভুল হয়ে গেছে কি না। চিত্র অংকনে কোনো প্রকার আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে কি না? যার কারণে নাম্বারে কোনো প্রকার কমতি হয়ে যেতে পারে। ইত্যাদি। তেমনি আল্লাহ ওয়ালারা সমস্ত ইবাদাত গুরুত্ব দিয়ে পালন করার পরও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শানের দিকে তাকিয়ে সব সময় ভীতসন্ত্রস্ত এবং শঙ্কায় নিমজ্জিত থাকে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। বলতে থাকে, হে আল্লাহ! আমার ইবাদাত এবং মোআমালাতে কোনো ভুল হয়ে গেলে নিজের করুণায় তা ক্ষমা করে দেন এবং কবুল করেন।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

বান্দার হক আদায়ের গুরুত্ব

ইসলাম মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, জীবনের কল্যাণও এরই মধ্যে নিহিত। হাদীসে আছে خيرا لأمور اوسطها মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা সর্ব বিষয়ে কল্যাণকর।

প্রতিটি মানুষের ওপর আদায়যোগ্য দুই ধরনের হক রয়েছে। এক. আল্লাহর হক। দুই. বান্দার হক। যেকোনো ব্যক্তি এই দুই ধরনের হক আদায় করতে পারবে, সে অন্যদের জন্য আদর্শ নমুনা হতে পারবে। রাসূল (সা.)-এর জীবনী অধ্যয়ন করে দেখুন তিনি আল্লাহর হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন। আর বান্দার হকও এমনভাবে আদায় করেছেন যে তাঁর নজির আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। নবীজি (সা.) পারিবারিক জীবনে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের হক পুরোপুরি আদায় করেছেন। বন্ধু মহলে বন্ধুত্বের হক আদায় করেছেন। সামাজিক জীবনে সমাজের প্রতিটি জীবের হক আদায়ে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাষ্ট্রীয় জীবনে রাষ্ট্রের প্রতিটি হক আদায় করেছেন পূর্ণ সতর্কতার সহিত। রাজনৈতিক জীবনে শত্রু-মিত্র সকলের হক আদায় করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তাই তো তাঁর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ঘোষণা করেন وانك لعلى خلق عظيم আর পুরো মানব জাতিকে লক্ষ করে বলেন, لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة বর্তমানে কিছু লোক দেখা যায়, নামাযের প্রতি যাদের মনোযোগ-অনুরাগ ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। কিন্তু বান্দার হকের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই, তাদের কাজেকর্মে-কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে না জানি কতজনের মনে কষ্ট লেগেছে, হৃদয় ভেঙেছে, অপমানিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, অপদস্থ হয়েছে, কিন্তু এদিকে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই, আর না আছে পরোয়া।

আরেক শ্রেণীর লোক আছে, যারা বান্দার হক আদায়ে পূর্ণ মনোযোগী, আচার-ব্যবহার সন্তোষজনক, যারপরনাই নম্র-ভদ্র। সকলের কছেই তারা সমাদৃত, তাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম কারো মনোকষ্টের কারণ হয়েছে–এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অতি মানবীয় সব গুণই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহর হকের বেলায় তারা বেখবর উদাসীন, নামাযের খবর নেই, রোজার খবর নেই, হজ-যাকাতের কোনো খবর নেই, আর না আছে হারাম থেকে বেঁচে থাকার স্পৃহা।

এই দুই শ্রেণীর প্রত্যেকেই রোগী, প্রকৃত অর্থে কেউ ভালো নয়, তারা কারো জন্য আদর্শ নমুনা হতে পারে না। আদর্শ নমুনা তো তারা হতে পারে, যারা আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আদায়ে সদা সচেষ্ট, আখেরাতে তারাই নিষ্কৃতি পাবে, উপরোল্লিখিত আধুরারা নয়। এ মর্মে রাসূল (সা.) ইরশাদ বরেন,

اول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة

কিয়ামতের দিন আল্লাহর হক নামাযের ব্যাপারে বান্দা প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হবে।

আল্লাহর হক কী? এ ব্যাপারে হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে,

قال النبى ﷺ يامعاذ اتدرى ماحق الله على العباد؟ قال : الله ورسوله اعلم، قال: ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔

হে মুআজ! তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো, তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করা। (বুখারী, মুসলিম শরীফ)

মূলত এই হাদীসে কোরআনের প্রতিধ্বনি হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

আমি জিন জাতি ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। (ইসরাঈল-২৩)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

ان الشرك لظلم عظيم

নিশ্চয়ই শিরিক চরম জুলুম। (লোকমান-১৩)

আরো ইরশাদ করেন,

واعبدوا الله ولا تشركوابه شيئا

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো জিনিসকে অংশীদার করো না। (নিসা-৩৬)

এ ছাড়া আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা থেকে প্রতিভাত হয় যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাঁর বিধিবিধানের প্রতি ঈমান রাখা, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী ও রাসূলগণ, ফেরেস্তা, জান্নাত, জাহান্নাম, আখেরাত ইত্যাদির প্রতি ঈমান রাখা আল্লাহর হক।

বান্দার হক আদায় করে আল্লাহর হক আদায় না করে যেমন কস্মিনকালেও ভালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আদর্শবান হওয়া যাবে না, তেমনি আল্লাহর হক আদায়কারী বান্দার হক আদায় না করলে আদর্শবান হওয়ার কল্পনা করতে পারবে; কিন্তু বাস্তবে নয়। আর আখেরাতে নিষ্কৃতি সুদূরপরাহত ব্যাপার মনে হবে, এ মর্মে কোরআনে ইরশাদ

হচ্ছে,

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

(গাফির-১৭)

আরো ইরশাদ করেন,

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

আর মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের ওপর কোনো জুলম করা হবে না। (যুমার-৬৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (যুমার-৭০)

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

কেউ কারো প্রতি জুলুম করে থাকলে সে যেন দুনিয়াতেই দায়মুক্ত হয়ে যায়, কারণ কাল হাশরে কোনো টাকা-পয়সা থাকবে না, ফলে জুলুম পরিমাণ নেকী তার আমলনামা থেকে নিয়ে হকদারকে দিয়ে দেওয়া হবে, দেওয়ার মতো নেকী না থাকলে হকদারের সঙ্গত পরিমাণ গোনাহ তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, হা. ৫৬৩৪)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا :الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

তোমরা কি জানো দেউলিয়া কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, অর্থকড়ি ও সহায়সম্বলহীন ব্যক্তি কেই তো দেউলিয়া মনে করা হয়। রাসূল (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দেউলিয়া ওই ব্যক্তি যে হাশরের ময়দানে আল্লাহর হক নামায, রোযা, যাকাত আমলনামায় নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু তার আমলনামায় এটাও দেখা যাবে যে সে বান্দার হক বিনষ্ট করেছে–একজনকে গালি দিয়েছে, আরেকজনের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, অন্যের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে, কাউকে খুন করেছে, আরেকজনকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। এদের প্রত্যেককেই তার নেকী দ্বারা বদলা দেওয়া হবে। যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায় তাহলে তাদের গোনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিযী, হা. ২৪১৮)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন,

يَحْشُرُ اللهُ -عز وجل -النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا "فَقُلْتُ :مَا بُهْمًا؟، قَالَ :لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، "ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ :أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ, وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ, حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ, وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ, حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ, حَتَّى اللَّطْمَةُ , "فَقُلْتُ :وَكَيْفَ؟, وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللهَ -عز وجل -عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟, قَالَ :بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ

আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে উচ্চস্বরে ঘোষণা করবেন, আমি জান্নাতি থেকে জাহান্নামীর হক উসূল করিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত পাওনাদার জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অনুরূপ জান্নাতী হকদারের হক জাহান্নামী হক বিনষ্টকারীর কাছ থেকে পরিশোধ না করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত জান্নাতী হকদার জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল (সা.) বলেন, হকের উসূল হবে নেকীও গোনাহের বিনিময়ে। (আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, হা. ৩৬০৮)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন,

اذا كان يوم القيامة جمع الله الاولين والاخرين ثم نادى مناد: الا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه، قال ينفرح المرأ ان يكون له الحق على والده او ولده او زوجته وان كان صغيرا۔

'কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা পূর্বাপর সকলকে একত্রিত করবেন। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে। কেউ কারো কাছ থেকে কোনো হক পাওনা থাকলে এসো এবং নিজের হক বুঝে নাও। তখন প্রতিটি ব্যক্তিই খুশি হবে সে তার পিতা অথবা সন্তান বা স্ত্রীর ওপর হকদার হওয়ার জন্য।' ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এই বাণীটি মূলত কোরআনের ঘোষণার প্রতিপাদন,

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যকার কোনো আত্মীয়তা বাকি থাকবে না এবং কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করবে না। (মুমিনুন-১০১)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۔ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

তা ঘটবে সেদিন, যেদিন মানুষ তার ভাই থেকেও পালাবে এবং নিজ পিতা-মাতা থেকেও এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকেও। (আবাসা-৩৪-৩৬)

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

যুগশ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ উলামায়ে কিরাম সকলেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন

বস্তুত এটাই কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার নিরাপদ পথ ও পন্থা

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

কোরআন-সুন্নাহ ও তা থেকে আহরিত সকল বিধিবিধান মেনে চলার মধ্যেই মুসলমানদের দো'জাহানের শান্তি ও কামিয়াবী নিহিত। তবে কোরআন-সুন্নাহর কিছু বিধান মামুলি শিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝতে সক্ষম; আর কিছু বিধান সংক্ষিপ্ততা ও সূক্ষ্মতাজনিত জটিলতার কারণে সকলে বুঝতে সক্ষম নয়। আবার কতক বিধান বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত, সূক্ষ্ম ও বাহ্যবিরোধপূর্ণ বিধানসমূহের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বুঝমতো সমাধান বের করে সে অনুযায়ী আমল করব, অথবা উম্মাহর স্বীকৃত সর্বোত্তম যুগের ইমামগণের দেওয়া সমাধান মেনে চলব। ইনসাফ ও বাস্তবতার বিচারে প্রথমটি আশঙ্কাপূর্ণ ও ভয়ানক, আর দ্বিতীয়টি সতর্কতাপূর্ণ ও নিরাপদ। এ জন্যই গোটা মুসলিম উম্মাহ হাজার বছর ধরে সর্বোত্তম যুগের সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের ব্যাখ্যার আলোকে কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করে আসছেন। বাস্তব কথা হলো, তাদের ব্যাখ্যা ও মাযহাবসমূহ আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় পরবর্তীকালে চার মাযহাবের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং মাযহাব কোনো নতুন জিনিস নয়। এই কারণে যে খায়রুল কুরূনের পর থেকে সকল মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ কোনো না কোনো ইমামের ব্যাখ্যার আলোকে কোরআন-সুন্নাহ মেনে আসছেন। অর্থাৎ তাঁরা সবাই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। বড় বড় কলেবরে রচিত যুগের ক্রমধারা অনুযায়ী এযাবৎকালের সকল মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মাযহাবভিত্তিক জীবনীকোষগুলোই এর প্রমাণ। যেগুলো "হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব" নামে পরিচিত। এখানে মৃত্যু-সনসহ শাস্ত্রজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মাযহাবভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো।

কুতুবে সিত্তাহ-এর লেখকগণ যে মাযহাবের অনুসারী ছিলেন

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু	মাযহাব
১	বুখারী শরীফ	ইমাম বুখারী	২৫৬ হি.	শাফেয়ী
২	মুসলিম শরীফ	ইমাম মুসলিম	২৬১ হি.	শাফেয়ী
৩	আবূ দাউদ শরীফ	ইমাম আবূ দাউদ	২৭৫ হি.	হাম্বলী
৪	নাসাঈ শরীফ	ইমাম নাসাঈ	৩০৩ হি.	হাম্বলী
৫	তিরমিযী শরীফ	ইমাম তিরমিযী	২৭৯ হি.	শাফেয়ী
৬	ইবনে মাজাহ শরীফ	ইমাম ইবনে মাজাহ	২৭৫ হি.	শাফেয়ী

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	আহকামুল কুরআন	ইমাম আবূ বকর আহমদ বিন আলী আল জাস্‌সাস	৩৭০ হি.
২	তাফসীরে সমরকন্দী	নসর ইবনে মুহাম্মাদ	৩৭৩ হি.
৩	তাফসীরে নাসাফী	আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ	৭০১ হি.
৪	তাফসীরে আবিস সাউদ	মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুস্তফা	৯৫২ হি.
৫	তাফসীরে মাযহারী	কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী	১২২৫ হি.
৬	রুহুল বয়ান	ইসমাঈল হক্কী	১১২৭ হি.
৭	রুহুল মা'আনী	শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আলূসী	১২০৭ হি.

৮	বয়ানুল কোরআন	আশরাফ আলী থানভী	১৩৬২ হি.
৯	মাআরিফুল কোরআন	মুফতী মুহাম্মাদ শফী	১৩৯৬ হি.
১০	মাআরিফুল কোরআন	মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী	১৩৯৪ হি.

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	আহকামুল কোরআন	মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আন্দালূসী	৫৪৩ হি.
২	তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ	আব্দুল হক ইবনে গালেব	৫৪৬ হি.
৩	আল জাওয়াহিরুল হিসান	আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আস সাআলাবী	৮৭৬ হি.
৪	তাফসীরে কুরতুবী	মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী	৬৭১ হি.
৫	আল বাহরুল মুহীত্ব	মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আন্দালূসী	৭৪৫ হি.
৬	আদ দুররুল মাছনূন	আবুল আববাস শিহাবুদ্দীন	৭৫৪ হি.
৭	তাফসীরে ইবনে উরফাহ	ইবনু উরফাহ	৮০৩ হি.

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	তাফসীরে ত্বাবারী	আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত-ত্বাবারী	৩১০ হি.
২	তাফসীরে বাগাবী	হুসাইন ইবনে মাসউদ আল বাগাবী	৫১৬ হি.
৩	তাফসীরে কাবীর	মুহাম্মাদ ইবনে উমর আর রাযী	৬০৬ হি.
৪	তাফসীরে বাইযাবী	আব্দুল্লাহ ইবনে বাইযাবী	৬৮৫ হি.
৫	তাফসীরে খাযেন	আব্দুল্লাহ ইবনে খাযেন	৭৪১ হি.
৬	তাফসীরে ইবনে কাসীর	ইসমাঈল ইবনে আমর দিমাশকী	৭৭৪ হি.
৭	তাফসীরে জালালাইন	জালালুদ্দীন মুহাল্লী	৮৬৪ হি.
৮	তাফসীরে জালালাইন, আদ দুররুল মানসূর	জালালুদ্দীন সুয়ূতী	৯১১ হি.
৯	তাফসীরে খতীব	মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ শিরবীনী	৯৭৭ হি.

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	তাফসীরে লুবাব	ইবনে আদেল আবী হাফস	৮৮০ হি.
২	তাহকীকু তাফসীরিল ফাতেহা	ইবনে রজব হাম্বলী	৭৯৫ হি.
৩	আত তাফসীরুল কায়্যিম	ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া	৭৫১ হি.

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	কিতাবুল আসার	ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.	১৮২ হি.
২	মুয়াত্তা	ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)	১৮৯ হি.
৩	ত্বহাবী শরীফ	ইমাম ত্বহাবী	৩১১ হি.
৪	কিতাবুয যুহদ	আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক	১৮১ হি.
৫	মুসনাদে আবু ইয়া'লা	আবূ ইয়া'লা আল মূসিলী	৩০৭ হি.
৬	ইকমালু তাহযীবিল কামাল	আলাউদ্দীন মুগলতায়ী	৭৬২ হি.

৭	আল জাওহারুননাকী	আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানী	৭৪৫ হি.
৮	উমদাতুল ক্বারী	বদরুদ্দীন আল আইনী	৮৫৫ হি.
৯	মিরক্বাত	মুল্লা আলী কারী	১০১৪ হি.
১০	তারীখে ইবনে মাঈন	ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন	২৩৩ হি.
১১	নাসবুর রায়া	ইউসুফ যাইলাঈ	৭৬২ হি.

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	আত্ তামহীদ	ইবনে আব্দিল বার মালেকী	৪৬৩ হি.
২	আরিযাতুল আহ্ওয়াযী	আবূ বকর ইবনুল আরাবী	৫৪৩ হি.
৩	শরহুয যুরকানী	আবূ আব্দিল্লাহ আয যুরকানী	১১২২ হি.

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	সহীহ ইবনে হিব্বান	ইবনে হিব্বান	৩৫৪ হি.
২	সহীহ ইবনে খুযাইমা	ইবনে খুযাইমা	৩১১ হি.
৩	মুসনাদে ত্বয়ালিসী	আবূ দাউদ আত ত্বয়ালিসী	২০৪ হি.
৪	সুনানে দারাকুতনী	আলী ইবনে উমর আদ দারাকুতনী	৩৮৫ হি.
৫	সুনানে বাইহাকী	আবূ বকর আল বাইহাকী	৪৫৮ হি.
৬	মুসতাদরাকে হাকেম	হাকেম আবূ আব্দিল্লাহ	৪০৫ হি.
৭	আল কামেল ফিত্ তারীখ	ইবনুল আসীর	৬০৬ হি.
৮	রিয়াযুস সালিহীন	মুহিউদ্দীন আন নববী	৬৭৬ হি.
৯	তাহযীবুল কামাল	আবুল হাজ্জাজ আল মিযযী	৭৪২ হি.
১০	তাযকিরাতুল হুফ্ফায	শামসুদ্দীন আয যাহাবী	৭৪৮ হি.
১১	ফাতহুল বারী	হাফেয ইবনে হাজার	৮৫২ হি.
১২	ফাতহুল মুগীছ	হাফেয শাসুদ্দীন আস সাখাবী	৯০২ হি.
১৩	তারীখে দিমাশ্ক্ব	ইবনে আসাকির	৫৭১ হি.
১৪	তারীখে বাগদাদ	আবূ বকর আল বাগদাদী (খতীব)	৪৬৩ হি.

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	সুনানে দারেমী	আবূ আব্দির রহমান আদ দারেমী	২৫৫ হি.
২	শরহু ইলালিত তিরমিযী	ইবনু রজব হাম্বলী	৭৯৫ হি.

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	আল মাবসূত	আবূ বকর আস সারাখসী	৪৯০ হি.
২	মুখতাসারুল কুদুরী	আবুল হাসান কুদূরী	৪২৮ হি.
৩	ফাতহুল ক্বাদীর	কামাল ইবনুল হুমাম	৮৬১ হি.
৪	আল বাহরুর রাইক্ব	ইবনে নুজাইম	৯৭০ হি.
৫	বাদাইউস্ সানায়ে	আলাউদ্দীন আল কাসানী	৫৮৭ হি.
৬	ফাতাওয়ায়ে শামী	ইবনে আবেদীন	১২৫২ হি.
৭	মাজমাউল আনহুর	আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ শাইখী যাদাহ	১০৭৮ হি.
৮	আদ্ দুর্রুল মুখতার	আলাউদ্দীন আল হাসকাফী	১০৮৮ হি.

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	আল ইহকাম	শিহাবুদ্দীন আল কারাফী	৬৮৪ হি.
২	বিদায়াতুল মুজতাহিদ	ইবনে রুশদ	৫৯৫ হি.
৩	মাওয়াহিবুল জালীল	মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আর রুআইনী	৯৫৪ হি.
৪	মুখতাসারুল আলামাহ	খলীল ইবনে ইসহাক আল জুনদী	৭৬৭ হি.
৫	আল মাদ্‌খাল	ইবনুল হাজ্জ	৭৩৭ হি.
৬	হাশিয়াতুদ দুসূকী	মুহাম্মাদ আদ দুসূকী	১২৩০ হি.

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	আত্ তাবসিরাহ	আবূ ইসহাক আশ শিরাজী	৪৭৬ হি.
২	আল হাবিউল কাবীর	আবুল হাসান আল মাওয়ারদী	৪৫০ হি.
৩	আল বদরুল মুনীর	ইবনুল মুলাক্কিন	৮০৪ হি.
৪	আল ওয়াসীত ফিল মাযহাব	ইমাম গাজালী	৫০৫ হি.
৫	আল বুরহান ফী উসূলিল ফিক্‌হ	ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালেক	৪৭৮ হি.
৬	নিহায়াতুল মুহতাজ	শামসুদ্দীন আর রমলী	১০০৪ হি.

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এবং তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ :

নং	কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১	আল মুগনী	ইবনে কুদামা	৬২০ হি.
২	আল আদাবুশ শারইয়্যাহ	ইবনে মুফলিহ	৭৬৩ হি.
৩	আল-উদ্দাহ শারহুল উমদাহ	আব্দুর রহমান বিন ইবরাহীম আল মাকদেসী	৬২৪ হি.
৪	মানারুস সাবীল	ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ	১৩৫৩ হি.
৫	তাবীলু মুখতালিফুল হাদীস	ইবনে কুতাইবা	১০৩৩ হি.
৬	মিনহাজুস সুন্নাহ	ইবনে তাইমিয়াহ	৭২৮ হি.

উম্মাহর এ সকল প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহসহ সকল প্রকার ইলমের ভাণ্ডার। যাদের কাছে উম্মত সর্বোতভাবে ঋণী এবং যাদের ইলম থেকে একমুহূর্তের জন্য বিমুখ হওয়ার কল্পনা করাও উম্মতের জন্য অসম্ভব। বলাবাহুল্য, তাঁরা সকলেই ছিলেন কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী। এখন এ সকল ব্যক্তিবর্গ যদি শুধুমাত্র মাযহাব মানার কারণে কিছু বন্ধুর দাবি অনুযায়ী মুশরিক হয়ে যান; তাহলে তাঁরা কিভাবে এ সকল মুশরিকদের (নাউযুবিল্লাহ) কিতাব থেকে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহসহ অন্যান্য ইলম গ্রহণ করছেন? আসলে "মাযহাব মানলে মুশরিক হয়ে যায়"–এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। বরং খায়রুল কুরূন থেকে এ যাবৎকাল মুসলিম উম্মাহ কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে।

অতএব, যারা কয়েকটি হাদীসের অনুবাদ পড়েই মুজতাহিদ-ইমাম বনে যাচ্ছেন, তাঁদেরকে তাঁদেরই একজন ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীর পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো মনে হচ্ছে। তিনি তাঁর "ইশাআতুস সুন্নাহ"তে বলেছেন, "আমার পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা হলো–যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া স্বাধীন মুজতাহিদ বনে যায়, অর্থাৎ মাযহাব ত্যাগ করে; শেষ পর্যন্ত সে দ্বীন থেকেই বের হয়ে যায়।"–ইশাআতুস সুন্নাহ, খণ্ড : ১ পৃ : ৪ (১৮৮৮ ইং)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর চলার ও অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

তালাক প্রয়োগ-পদ্ধতি

মুফতী শরীফুল আজম

তালাকের পরিস্থিতি :

সংগত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া যাবে না। তালাকের ক্ষমতা আছে বলেই তা যত্রতত্র প্রয়োগ করার অবকাশ নেই। বরং এর জন্য শরীয়তের কিছু দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রথমত, তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়েছে কি না, তা দেখতে হবে। অভিভাবকদের সাথে বুঝতে হবে। বিজ্ঞ মুফতীর পরামর্শ নিতে হবে–এরপর এগোতে হবে। হুট করে যারা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আজীবন তাদের আফসোস করতে দেখা যায়। বিশেষ করে বিষয়টি পারিবারিক হওয়ায় অশান্তির অন্ত থাকে না। ব্যক্তি থেকে পরিবার, অতঃপর সমাজ পর্যন্ত এর তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ে।

তালাকের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এটি শরীয়তের যাবতীয় বিধিবিধানের মাঝে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় একটি বিধান, হাদীসের ভাষায় বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

عن ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ قال: ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق (سنن ابى داود ٣٠٣/١، المستدرك للحاكم ٢١٨/٢، السنن الكبرى ٣١٦/٧)

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, তালাক মূলত নিষিদ্ধ বস্তু, অর্থাৎ সংগত কারণ ছাড়া তালাক প্রদান নিষেধ। অতএব সংগত কারণ বা প্রয়োজন দেখা না দিলে তা মূল বিধানের ওপর বাকি থাকবে।

واما الطلاق فان الاصل فيه الحظر بمعنى انه محظور الا لعارض يبيحه فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على اهله من الحظر (شامى ٢٢٨/٣)

واما وصفه فهو انه محظور نظرا الى الاصل ومباح نظرا الى الحاجة (هندية ٣٤٨/١)

বনিবনা না হওয়া :

শরীয়ত কর্তৃক কিছু হক নির্ধারিত রয়েছে যেগুলো আদায়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ। স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্রে যদি এমন কোনো আচরণ থাকে, যার ফলে শরীয়ত নির্ধারিত হক আদায়ে ব্যর্থতা দেখা যায়, উপরন্ত এর ফলে দ্বীনের অন্যান্য হুকুম-আহকামও লঙ্ঘনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে সেই ক্ষেত্রে তালাকের প্রয়োজনকে স্বীকার করা হবে। অহেতুক মনোমালিন্য বা পছন্দ-অপছন্দকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অচলাবস্থা তালাকের প্রকৃত প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না। অতএব বনিবনা হওয়া-না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে শরীয়তের নীতিমালা অনুসারে।

اما سببه فالحاجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله (فتح القدير ٤٤٣/٣)

ولا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق (الدر مع الرد ٤٤٤/٣)

মনে রাখা দরকার, শরীয়ত যে সকল ক্ষেত্রে তালাকের অনুমতি দেয় সেখানেও কিন্তু বাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রদান করে না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, স্বামী-স্ত্রী চাইলে সম্পর্ক বহাল রাখতে পারে।

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة (الدر ٥٠/٣)

তালাক চাওয়া :

শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া অযথা রাগে বা অভিমানে বনিবনা না হওয়ার অভিযোগ তুলে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া মারাত্মক গোনাহ। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যে নারী শরীয়তসিদ্ধ কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে অহেতুক তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের খোশবু হারাম। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

عن ثوبانؓ قال: قال رسول الله ﷺ ايما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (سنن ابى داؤد رقم ٢٢٢٦، سنن الترمذى رقم ١١٨٧)

স্ত্রী তালাক চাওয়ার পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয়, এ ব্যাপারে স্বামীকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। স্ত্রীর খোরপোশ ও বাসস্থানের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। তিক্ততা এড়িয়ে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (সা.) যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ রাখলে দাম্পত্য জীবনের অনেক সমস্যা সহজেই সমাধান হয়ে যায়। নবীজি (সা.) বলেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে হিতাকাঙ্ক্ষী সুলভ আচরণ করো। কেননা তাদের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাও আবার পাঁজরের একেবারে ওপরের হাড় থেকে, যা কিনা সর্বাধিক বক্র। তুমি যদি এটাকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে দিন দিন আরো বাঁকা হবে। অতএব তোমরা তাদের সাথে হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ আচরণ করো। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا

بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (بخارى ٢/٧٧٩، مسلم ١/٤٧٥)

নবীজি (সা.) বলেন, কোনো মুমিন স্বামী যেন মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। স্ত্রীর কোনো আচরণ যদি খারাপও লাগে অপরটি তো ভালো লাগে। (মুসলিম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ :غَيْرَهُ (مسلم ١/٤٧٥)

তালাকের ক্ষমতা কার?

ক্ষমতা যার হাতে আসে তার দায়দায়িত্ব বেড়ে যায়। সর্বক্ষেত্রে তাকে ধৈর্য আর সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। পরম সহিষ্ণু হিসেবে রয়ে-সয়ে চালাতে হয় অধীনস্তদের। আর এমন যোগ্যতা সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের মাঝে তুলনামূলক বেশি রয়েছে। তাই তো নর-নারীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ বান্দাগণের প্রতি করুণাস্বরূপ তালাকের ক্ষমতা পুরুষদের হাতে অর্পণ করেছেন। যাতে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা সহজে ঘটতে না পারে। এর বিপরীত নারীদের হাতে এই ক্ষমতা থাকলে কী দুর্দশা হতে পারে তা প্রচলিত কাবিননামার ১৮ নং কলামের ক্ষমতাপ্রাপ্তা নারীদের ডিভোর্সের সংখ্যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষ তালাকদাতা আর নারী তালাকগ্রহীতা বা পাত্র। পুরুষের ওপর কখনো তালাক পতিত হবে না, হবে নারীর ওপর। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে তালাক দিলাম তবে তা ধর্তব্য হবে না। কাবিননামার ১৮ নং কলামে স্বামী কর্তৃক তালাকের ক্ষমতা পেলেও স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবে না বরং নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে অনেকে ভুল করে থাকে। কাজি অফিস বা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে স্ত্রীর পক্ষ থেকে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে লেখা হয় 'কাবিননামায় প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে স্বামীকে তালাক দিয়ে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিলাম। অথচ এটা ভুল, এভাবে লিখলে তালাক কার্যকর হবে না। অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও বৈধ হবে না। অর্পিত ক্ষমতাবলে তালাক কার্যকর হতে হলে স্ত্রী এভাবে লিখবে–অর্পিত ক্ষমতাবলে নিজের নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করিলাম।' কেননা তালাকের পাত্র স্ত্রী, স্বামী নয়।

قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء (النساء :٣٤)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ :فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (سنن ابن ماجة رقم : ٢٠٨١)

ان الذى يملك الطلاق انما هو الزوج--- ولا تملكه الزوجة جعل الطلاق بيد الزوج لا يبد الزوجة (الفقه الاسلامى وادلته ٧/٣٤٧)

ومحله المنكوحة واهله الزوج (در مختا ٤/٤٣١)

ولا تصح اضافة الطلاق الا اليها (هداية ٢/٣٦٧)

তালাকের সংখ্যা :

তালাকের নির্ণয় হয় স্ত্রীর দিকে লক্ষ করে। স্বাধীন নারীদের তালাক তিনটি। ভিন্ন ভিন্ন তিন তালাক তাকে দেওয়া যাবে, স্বামী স্বাধীন হোক বা গোলাম। তিন তালাকের আগ পর্যন্ত তাকে নিয়ে সংসার করার সুযোগ আছে। এক তালাক দিয়ে প্রত্যাহার করা হলো এর পর আবার এক তালাক দেওয়া হলো তখনও প্রত্যাহার করা যাবে। তৃতীয় তালাকটি দিয়ে দিলে স্ত্রীকে আর স্বাভাবিক ফিরিয়ে আনার অবকাশ থাকবে না।

তালাকের সংখ্যা তিনটি হওয়ার মানে এই নয় যে তালাক দিতে হলে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক এভাবেই বলতে হবে। এ ভুলটি অনেকেই করে থাকে। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথক পৃথক তিন তালাক। একসাথে বা এক বাক্যে তিন তালাক কাম্য নয়, যদিও তা কার্যকর হয়ে যায়। কেহ তার স্ত্রীকে এক তালাক দিলে তার হাতে আর দুই তালাক অবশিষ্ট থাকে। ওই স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় সংসার করলে ভবিষ্যতে দুই তালাকের মালিক থাকবে, এমতাবস্থায় কখনো দুই তালাক দিলে তা পূর্বের সাথে যোগ হয়ে তিন গণ্য হবে এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে না। অনুরূপ প্রথমে দুই তালাক দিলে হাতে বাকি থাকবে এক তালাক।

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (سنن الترمذى رقم ١١٨٢)

طلاق الامة ثنتان حرا كان زوجها او عبدا وطلاق الحر ثلث حرا كان زوجها او عبدا (هداية ٢/٣٥٩)

নাবালকের তালাক :

তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য তালাকদাতা বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া অন্যতম শর্ত। নবালকের তালাক কার্যকর হয় না। নাবালককে তার অভিভাবক চাইলে বিবাহ করাতে পারে কিন্তু তালাক তার পক্ষেও দেওয়া সম্ভব নয়। বালেগ হওয়ার পূর্বে ওই বিবাহ ভাঙার অবকাশ নেই। যদি তার অভিভাবক বা কোনো ফুজুলী ব্যক্তি নাবালকের স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সেটা তার বালেগ হওয়ার পর তার নিজস্ব সিদ্ধান্তের ওপর মওকুফ থাকবে।

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। পাগলের হুকুম ব্যক্ত করতে গিয়ে শরীয়তে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যথা–

مغلوب على عقله، مبرسم، مغمى عليه، مدهوش، معتوه، مجنون

মূলত এর সবগুলো পাগলের বিভিন্ন প্রকার এবং সমার্থবোধক শব্দ। যদিও সংজ্ঞার মাঝে কিছু পার্থক্য করা হয়ে থাকে। যেমন–

المجنون : هو من لايستقيم كلامه وافعاله۔

المدهوش: هو الذاهب عقله حياء او خوفا او غضبا۔

المعتوه : هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسدا التدبير شبيه بالمجنون وذلك لما يصيبه فساد فى العقل من وقت الولادة۔

المبرسم : هو المعلول بعلة البرسام بالكسر وهو وجع يحدث فى الدماغ ويذهب منه عقل الانسان وكثير ما يهلك (قواعد الفقه)

الاغماء: مرض يزيل القوة ويستر العقل ۔۔۔ والفرق بين العته والاغماء : ان الاغماء مؤقت والعته مستمر غالبا والاغماء يزيل القوى كلها، والعته يضعف القوى المدركة (لسان العرب)

আল্লামা শামী (রহ.) এর সংজ্ঞা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন– وهو اختلال فى العقل এমন ব্যক্তি, যার আকলের মাঝে বিকৃতি দেখা দিয়েছে তাকে معتوه বলে। অথচ 'আলবাহরুর রায়েক' গ্রন্থে এটাকে পাগলের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে معتوه এর সংজ্ঞাও এটি অর্থাৎ উভয়ের সংজ্ঞা একই। এরপর আল্লামা শামী (রহ.) দুয়ের সংজ্ঞার মাঝে একটু পার্থক্য করে দিয়েছেন এভাবে–

واحسن الاقوال فى الفرق بينهما ان المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب

ক্ষেত্রে আদালত পাগলের চিকিৎসার জন্য এক বছর সময় দেবেন। এর পরেও যদি ভালো না হয় তবে বিবাহ ভেঙে দেবেন। বিচ্ছেদের পর স্ত্রী ইদ্দত পালন করে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে।

اخرج البخارى تعليقا : قال علىؓ وكل طلاق جائز الا طلاق المعتوه (بخارى ٢/٧٩٤)

عن ابى هريرةؓ ان النبى ﷺ قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله (سنن الترمذى ١١٩١)

عن عمروؓ قال: سئل جابرؓ عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين اخذه جنونه ؟ قال لا يجوز (المصنف لابن ابى شيبة رقم ١٨٢١١)

عن الشعبى قال: لايجوز طلاق المغلوب على عقله (سنن سعيد ابن منصور رقم ١١٢٤)

لايقع طلاق المجنون والمدهوش والنائم (شامى ٣/٢٤٢)

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ :عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (سنن الترمذى ١٤٢٣)

কোনো ব্যক্তি পাগল কি না তা নির্ণয় করা সহজ হয় যদি তার আচরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। পাগল হিসেবে পরিচিত বা সর্বস্বীকৃত হয়। সে ক্ষেত্রে তার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম-আহকাম বলে দেওয়া তেমন জটিল হয় না। এর বিপরীত কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে পাগল হওয়ার দাবি করা হলে বা তালাক দেওয়ার সময় হুঁশ ছিল না বলা হলে তার হুকুম বের করা কিছুটা কঠিন হয়ে থাকে। বিজ্ঞ মুফতীর পরামর্শ ছাড়া এমন ব্যক্তির হুকুম বলে দেওয়া নিরাপদ নয়। অনেক সময় তাকে উপস্থিত করে পর্যবেক্ষণেরও প্রয়োজন হতে পারে। তা ছাড়া বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামত এ

বালেগ হয়ে সে যদি নিজের পক্ষ থেকে তালাক দেয় তবে তালাক হবে অন্যথায় নয়।

عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ (سنن دارمى رقم ٣٣٣٧)

ولا يقع طلاق الصبى والمجنون والنائم لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز الا طلاق الصبى والمجنون (هداية ٢/٢٥٨)

নাবালক যদি বুদ্ধিমান হয় অন্য সব মো'আমালা বুঝে তবুও তার তালাক কার্যকর হবে না। অনুরূপ মুরাহেক যে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি, সেও নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে না।

ولم يكف عقل الصبى العاقل لانه لم يبلغ الاعتدال (فتح القدير ٣/٤٦٩)

قوله: لاطلاق الصبى والمجنون۔۔۔ اطلق الصبى فشمل العاقل ولو مراهقا لفقد اهلية التصرف خصوصا ماهو دائر بين النفع والضرر۔۔۔ وفى البزازية: لو طلق رجل امرأة الصبى فلما بلغ الصبى قال اوقعت الطلاق الذى اوقعه فلان يقع ولو قال اجزت ذلك لا يقع (البحر الرائق ٣/٢٤٩)

পাগলের তালাক :

শরীয়তের দৃষ্টিতে পাগলের তালাক কার্যকর হয় না। পাগলকে তার অভিভাবক বিয়ে করাতে পারে কিন্তু তার বউকে তালাক দিতে পারে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার সাথে ঘর-সংসার করতে না চায় তবে মুক্তির কয়েকটি পথ রয়েছে। স্বামী সুস্থ হলে তার কাছ থেকে তালাক নেওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। অথবা সুস্থ অবস্থায় তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পণ করে থাকলে ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে শরয়ী আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসারে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এ

এদের তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

او هازلا لايقصد حقيقة كلامه او سفيها خفيف العقل (در مختار)

قوله خفيف العقل : فى التحرير وشرحه: السفه فى اللغة الخفة وفى اصطلاح الفقهاء : خفة تبعث الانسان على العمل فى ماله بخلاف مقتضى العقل (شامى ٤٣٢/٤)

الجواب: یہ شخص مجنون نہیں جس کی طلاق واقع نہ ہو بلکہ طلاق ایسے کی واقع ہوجاتی ہے (فتاوی دار العلوم ۹/۵۷)

রাগের মাথায় তালাক :

ফুকাহায়ে কেরামের মতে রাগ তিন প্রকার হতে পারে। যেমন–সাধারণ, মধ্যম ও প্রচণ্ড। ফাতওয়ায়ে শামীতে হাফেজ ইবনুল কাইয়্যুম হাম্বলী (রহ.)-এর পুস্তিকা থেকে এই তিন প্রকারের কথা নকল করা হয়েছে। এর মাঝে সাধারণ রাগ হলো এমন অবস্থা, যে অবস্থায় মাথা ঠিক থাকে এবং কী বলছে বা চাচ্ছে, তা বুঝতে পারে। আর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে এমন অবস্থা, যে অবস্থায় নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কী বলছে বা করছে, তা বুঝতে পারে না। অনেকটা পাগলের মতো হয়ে যায়। আর মধ্যম ধরনের রাগ হচ্ছে এতদুভয়ের মাঝামাঝি অবস্থার নাম। যে অবস্থায় একেবারে পাগলের মতো আচরণও করে না, আবার হিতাহিত জ্ঞানও থাকে না। সাধারণ ও মধ্যম রাগ তালাকের জন্য অন্তরায় নয়। এমন রাগের মাথায় তালাক দিলে তা কার্যকর হয়ে যায়।

قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلى رسالة فى طلاق الغضبان قال فيها: انه على ثلاثة اقسام، احدها: ان يحصل له مبادى الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم مايقول ويقصد، وهذا لا اشكال فيه- الثانى : ان يبلغ النهاية فلا يعلم مايقول ولا يريد، فهذا لاريب انه لاينفذ شئ من اقواله، الثالث : من توسط بين

সেও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ধরনের ব্যক্তির অধিকাংশ কথা ও কাজের মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত অসংলগ্ন ভাব থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথাবার্তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে যা বলে তা জানে এবং স্বেচ্ছায় বলে। কেননা এমন জানা ও ইচ্ছা গ্রহণযোগ্য হয় না। যেহেতু তা সুস্থ মস্তিষ্ক এবং সঠিক ধীশক্তি থেকে হচ্ছে না। যেমন বুদ্ধিমান শিশুর কথা গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে স্ত্রী পাগল হলে স্বামীর তালাক তার ওপর কার্যকর হয়ে যাবে।

সাময়িক পাগল :

অনেক মানসিক রোগী এমনও আছে, যারা বছরের কিছু দিন ভালো থাকে। এদের তালাকের বিধান নির্ণয়ের পূর্বে দেখতে হবে তালাক দেওয়ার সময় তার অবস্থা কী ছিল? সুস্থ অবস্থায় দিয়ে থাকলে তালাক কার্যকর হবে অন্যথায় হবে না।

عن قتادة قال الجنون جنونان فان كان لايفيق لم يجزله طلاق وان كان يفيق فطلق فى حال افاقته لزمه ذلك (المصنف لابن ابى شيبة رقم ١٨٢٢٩)

فما دام فى حالة غلبة الخلل فى الاقوال والافعال لا تعتبر اقواله وان كان يعلمها ويريدها (شامى ٤٣٩/٤)

নির্বোধ বোকার তালাক :

অনেক লোক এমনও আছে, যার কাজকর্ম, কথাবার্তা বুদ্ধিমানের মতো হয়ে থাকে। কাপড়চোপড় ঠিকঠাক পরে। কিন্তু লেনদেন বোঝে না। পনের টাকার জিনিস পাঁচ টাকা বিক্রি করে দেবে। কেহ কোনো ফরমায়েশ করলে তাই পুরা করবে। এমনটি যদি কেহ বলে তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। সেটাও করে দেখাতে পারে বা টাকার লোভ দেখালে তালাক দিয়ে দিতে পারে–এমন নির্বোধ বোকা শরীয়তের দৃষ্টিতে পাগলের শ্রেণীভুক্ত নয় বিধায়

ولا يشتم بخلاف الجنون (شامى ٤٣٨/٤)

معتوه হচ্ছে যার হিতাহিত জ্ঞান কম, কথা এলোমেলো এবং কাজকর্ম উল্টাপাল্টা। তবে সে মারধর ভাঙচুর বা গালাগালি করে না। পক্ষান্তরে পাগলের মাঝে এসব আচরণ পাওয়া যায়।

তা ছাড়া البحر الرائق গ্রন্থে পাগলের সংজ্ঞার মাঝে,

العته والاغماء والبرسام والدهش

সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় স্বাভাবিক যে আচরণ একজন সুস্থ মানুষ করে থাকে এর ব্যতিক্রম হলেই সেটা পাগলের কোনো এক প্রকার বলে ধরা হবে। অধিকাংশ কাজ যদি এমন অসংলগ্ন হয় তবে সে পাগল বলে গণ্য হবে। কেননা পাগলও মাঝে মাঝে একেবারে সুস্থ মানুষের মতো কথা বলে। অথচ তার পাশে কিছুক্ষণ বসলেই এর বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লামা শামী (রহ.) এ-সংক্রান্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ এভাবে ব্যক্ত করেন–

فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل فى اقواله وافعاله الخارجة عن عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر او لمرض او لمصيبة فاجأته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الاقوال والافعال لا تعتبر اقواله وان كان يعلمها ويريدها لان هذه المعرفة والارادة غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لاتعتبر من الصبى العاقل (شامى ٤٣٩/٤)

সকল আলোচনার ফল এই দাঁড়ায় যে পাগলের হুকুম ওই সকল ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হবে, যার অধিকাংশ কথা ও কাজ অসংলগ্ন এবং অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। অনুরূপ বার্ধক্য অথবা কোনো রোগব্যাধি বা বালা-মুসিবতের কারণে যার ব্রেন অকেজো হয়ে যায়

مرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والادلة تدل على عدم نفوذ اقواله- ملخصا من شرح الغاية الحنبلية لكن اشار في الغاية الى مخالفته في الثالث حيث قال: ويقع طلاق من غضب خلافا لابن القيم، وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش (شامی ٤/٤٣٩)

سوال: غضب کے تین درجہ ہیں، مبادی، متوسط، نہایت، اول کے دو درجوں میں وقوع طلاق کا فتوی دینا صحیح اور حق ہے یا نہ؟

الجواب: حنفیہ کا مذہب ایسا ہی معلوم ہوتا ہے (فتاوی دارالعلوم ۹/۵۷)

রাগের তৃতীয় প্রকার প্রচণ্ড রাগের ক্ষেত্রে দেখা যায় রাগ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে রাগের অবস্থায় তার নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কী বলে বা করে কিছুই বোঝে না। রাগ থামলে স্মরণও করতে পারে না যে সে কী বলেছে বা করেছে–এমন ব্যক্তি রাগের সময় ভাঙচুর বা কাউকে মারধরও করে থাকে। এ ধরনের রাগ একটি মানসিক রোগ। এমতাবস্থায় যদি কেহ তালাক দেয় তবে হুঁশ ফেরার পর যদি সে তালাকের কথা স্মরণ করতে পারে তবে তা কার্যকর বলে গণ্য হবে, অন্যথায় তালাক হবে না।

وفي رد المحتار نقلا عن الخيرة وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلثا في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش فاجاب نظما ايضا بان الدهش من اقسام الجنون فلا يقع واذاكان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان (شامی ٤/٤٣٨)

এ ধরনের রাগীদের ব্যাপারে ফয়সালা অনেকটা তাদের নিজস্ব বক্তব্যের ওপর করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে যদি বলে যে রাগের সময় আমি কী বলেছি তা বলতে পারব না, তবে তার কথার ভিত্তিতে ফাতওয়া দেওয়া হয়। তবে অনেক সময় প্রত্যক্ষদর্শীরাও তার ওই অবস্থার সাক্ষ্য দিতে পারে যে সে প্রচণ্ড রাগের অবস্থায় ছিল, ওই সময় সে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। এমন রাগের মাথায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না।

خود کہنے سے بھی معلوم ہوسکتا ہے اور بعض دفعہ دوسرے لوگ بھی قرائن سے معلوم کر سکتے ہیں مثلا ایسے اموراس سے سرزد ہوں کہ ان کو وہ حالت ہوش میں نہیں کرسکتا جیسا کہ دیوانوں اور باولوں کو دیکھا جاتا ہے (فتاوی دارالعلوم ۹/۱۲۰)

جب غصہ اس درجہ پہنچ جاوے کہ کچھ ہوش وحواس نہ رہیں تو ایسی حالت کی طلاق واقع نہیں ہوتی (فتاوی دارالعلوم ۹/۸۴)

طالق مدعی اس امر کا ہے کہ مجھے بوجہ غایت غیظ وغضب کے کچھ خبر طلاق کی نہیں رہی تو مابینہ وبین اللہ اسکی زوجہ پر طلاق واقع نہ ہوگی (فتاوی دارالعلوم ۹/۸۵)

রাগের এ সকল পর্যায় বিচার-বিশ্লেষণ করে হুকুম নির্ণয় করা খুবই জটিল একটি বিষয়। তাই এ ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে সতর্কতার ভিত্তিতে ফয়সালা করাই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু বিষয়টি স্ত্রী হালাল-হারাম হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত তাই এখানে সতর্কতা হলো তালাক কার্যকর হওয়ার ফয়সালা করা।

اور باب حرمت فروج میں احتیاط تام لازم ہے لہذا سوال مذکور میں جوصورت بیان کی گئی ہے جو کہ غضب میں ہوئی ہے اسکا جواب یہی ہونا چاہئے کہ طلاق واقع ہے (فتاوی دار العلوم ۹/۱۲۰)

মনে মনে তালাক :

তালাকের উচ্চারণ ছাড়া মনে মনে তালাক দিলে তা ধর্তব্য হবে না। অনেক লোক আছে মনে মনে বিভিন্ন কথা কল্পনা করে এবং তা অনেক সময় প্রবল আকারে দেখা দেয়। অনেক সময় মনে মনে কোনো বিষয় আওড়াতে গিয়ে এক দুটি শব্দও মুখ থেকে নির্গত হয়। আবার অনেকে তালাকের ওয়াসওয়াসায় ভোগে। তালাকের কল্পনা করতে গিয়ে কিছু বলে ফেলেছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যক্তি নিশ্চিত করে তালাক উচ্চারণের কথা বলতে না পারলে তালাক কার্যকর হবে না।

واما الطلاق والعتاق فلا يقعان بالنية بل لا بد من التلفظ (الاشباه والنظائر ص ٨٩)

ركنه اى ركن الطلاق لفظ مخصوص (در مختار) وهو ما جعل على معنى الطلاق من صريح او كناية (الى قوله) واراد اللفظ ولو حكما (شامى ٤/٤٢٠)

سوال: نکاح ہونے سے تھوڑی دیر بعد اس کے دل وزبان پر شیطانی وسوسہ خیالات فاسدہ آپ ہی آپ بلا نیت وقصد وارادہ کے جاری ہوگئے ہوں کہ تو نے فلاں کو قبول کیا یا نہیں، میں نے نہیں کیا یا میں اسکو ترک کیا اور دل میں خیالات فاسدہ ہوکر بلا ارادہ کے آہستہ زبان سے کوئی لفظ طلاق وغیرہ بھی نکل گیا ہو تو اس شخص کا نکاح صحیح رہا یا نہیں۔

الجواب: ایسے وساوس اور خیالات اور حرکت لسانی وہمی سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور نکاح نہیں ٹوٹتا جیسا کہ درمختار میں ہے وادنى المخافة سماع نفسه ومن يقربه الخ ويجرى ذلك المذكور في كل ما يتعلق بنطق كتسمية على ذبيحة الخ وعتاق وطلاق الخ (*فتاوی دارالعلوم ۹/۱۰۰*)

উল্লেখ্য যে মনে মনে বা কল্পনায় তালাক দেওয়ার পর তা কার্যকর হয়ে গেছে ভেবে পরবর্তীতে যদি কারো কাছে বলে যে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। তবে তার এই স্বীকারোক্তির কারণে তালাক পতিত হয়ে যাবে। পূর্বের কল্পনার কারণে নয়।

ولو اقر بالطلاق --- وقع قضاء (رد محتار مع الشامى ٤/٤٤٠، البحر الرائق ٣/٤٢٨)

জাদু, বাণ, জীনের আসরে তালাক :

জিনে ধরা রোগী বা জাদুটোনাগ্রস্ত

লোকের তালাক কার্যকর হবে কি না, তা নির্ভর করে তার অবস্থার ওপর। জিন যদি তার ওপর সাওয়ার অবস্থায় থাকে, কী বলছে বা করছে সে কিছুই জানে না বরং তার ওপর সাওয়ার জিনই মূলত কথাগুলো বলে থাকে। হুঁশ ফেরার পর সে ওই সব কথা বা কাজ স্মরণ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তালাক দিলে ওই তালাক কার্যকর হবে না। যেহেতু কথাগুলো সে বলেনি বা তার স্ত্রী এখানে উদ্দেশ্য ছিল না। অনুরূপ জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিও যদি এ ধরনের অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করে তবে ওই অবস্থার তালাক ধর্তব্য হবে না।

ان الصريح لا يحتاج الى النية ولكن لابد فى وقوعه قضاء وديانة من قصد اضافة لفظ الطلاق اليها عالما بمعناه۔۔۔ ولو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع اصلا على ما افتى به مشائخ اوزجند صيانة عن التلبيس (شامى ٤/٤٦١، تاتار خانيه ٣/٢٨٦)

لا يقع طلاق الصبى وان كان يعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش (هنديه ١/٣٥٣)

মাতালের তালাক :

শরীয়তের দৃষ্টিতে সকল প্রকার মাদক হারাম। হাদীসের ভাষায় মদ সকল পাপ কর্মের চাবিকাঠি। মাদক সেবনের ফলে যদিও জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকে না তবুও মাতালের তালাক কার্যকর হয়ে যায়। মাদকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং তা সেবন থেকে সতর্ক করতেই শরীয়তে এই বিধান রাখা হয়েছে। হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর যুগে রমলা বিনতে তারেকের স্বামী মাতাল অবস্থায় তাঁকে তালাক দিলে তিনি ওই তালাক কার্যকর হওয়ার ফয়সালা দেন।

طلق رجل امرأته رملة بنت طارق فاجازه معاوية عليه (المصنف لعبد الرزاق رقم ١٢٣٠١)

এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) মধ্য হতে হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যোবাইর (রা.) প্রমুখ সাহাবাদের মতে মাতালের তালাক কার্যকর হয়ে যায়। (বেনায়া শরহে হেদায়া-২/২২৫)

তাবেঈনদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ১৭ জন তাবেঈন থেকে মাতালের তালাক কার্যকর হওয়ার ফাতওয়া পাওয়া যায়। পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাব কিছুটা অস্পষ্ট থাকলেও বাকি তিন ইমামদের মাযহাবে মাতালের তালাক কার্যকর হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।

وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وابراهيم والزهرى والشعبى وبه قال الاوزاعى والثورى ومالك وابوحنيفة وعن الشافعى قولان الصحيح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس (فتح البارى ٩/٣٩١)

وطلاق السكران واقع اذا سكر من الخمر او النبيذ وهو مذهب اصحابنا (الفتاوى التاتار خانيه ٤/٣٩٤)

নেশাজাত দ্রব্য :

মাদকের বিভিন্ন ধরন বা প্রকার রয়েছে। মদ উন্নতমানের হোক বা তারী জাতীয় হোক এর দ্বারা মাতাল হলে সর্বাবস্থায় তালাক হয়ে যাবে। চাই ইচ্ছায় পান করুক বা জবরদস্তি, জেনে পান করুক বা না জেনে, ভুলে বা জরুরতে হোক–সর্বাবস্থায় একই হুকুম।

طلاق السكران واقع اذاسكر من الخمر او النبيذ فلو اكره على الشرب فسكر او شرب للضرورة فذهب عقله يقع طلاقه (بناية ٢/٢٢٥، قاضيخان ١/٢٨٦)

মধু বা বিভিন্ন শস্যদানা থেকে প্রস্তুত মাদকের হুকুম নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী মদের ন্যায় অভিন্ন। তথা এর দ্বারা নেশা করে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে।

ولومن الاشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر المختار فى زماننا لزوم الحد لان الفساق يجتمعون عليه وكذا المختار وقوع الطلاق (الفتاوى البزازية ١/١١١)

গাঁজা অথবা ভাং খেয়ে মাতাল ব্যক্তি যদি পূর্ব হতে এর নেশার বিষয়ে অবগত হয় তবে তার তালাক কার্যকর হবে। হ্যাঁ, যদি তা গ্রহণ করার সময় সে না জানে যে এর দ্বারা নেশা হয় এবং অজান্তে গ্রহণ করার পর নেশাগ্রস্ত হয়ে তালাক দেয় তবে সেটা গ্রহণ যোগ্য হবে না।

قال سئل ابو حنيفةؒ وسفيان الثوريؒ عن رجل شرب البنج فارتفع الى رأسه فطلق قالا ان كان يعلم حين شرب ماهو؟ يقع والا لايقع (بناية ٥/٣٠٠)

আধুনিক যুগের যত মাদক আছে, হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা অথবা এ ছাড়া আরো যত হতে পারে সেগুলোকে মাদক জেনে নেশা করা হলে এ ধরনের মাতালের তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

জবরদস্তি তালাক :

অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে। বিভিন্ন চাপে এমন হতে পারে জানের ভয়ে, মালের ভয়ে বা ইজ্জত-সম্মানের ভয়ে হতে পারে। মানসিক চাপ বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া এমন তালাকের ক্ষেত্রে দেখতে হবে বাধ্য হয়ে তালাক দেওয়ার ঘটনাটি লিখিত হয়েছে না মৌখিক। যদি মৌখিক তালাক দিয়ে থাকে তবে তা কার্যকর হয়ে যাবে। নবীজি (সা.)-এর যুগে এমন একটি ঘটনা হয়েছিল। এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী ঘৃণা করত। দুজনের মাঝে বনিবনা হচ্ছিল না। একদিন লোকটি ঘুমিয়ে

অনুরূপভাবে যদি কাউকে তালাক দিতে বাধ্য করা হয় আর সে জান বাঁচাতে শুধু মাথা দিয়ে ইশারা করে তালাক দেয় মুখে তালাক উচ্চারণ না করে তাহলে শুধু মাথার ইশারা দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই ইশারা থেকে তালাক বুঝে থাকে।

امرأة قالت لزوجها: طلقنى فاشار اليها بثلاثة اصابع ونوى به ثلاث تطليقات لا تطلق مالم يتلفظ به (خانية على هامش الهندية ١/٢٨٠)

বাধ্য হয়ে তালাক দেওয়ার সময় কেহ যদি কৌশলে তালাক শব্দটি বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে তালা, তালাগ, তালাখ বা তালাল ইত্যাদি বলে তবুও এর দ্বারা তালাক হয়ে যাবে।

ويقع بها اى بهذه الالفاظ وما بمعناها من الصريح ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك و تلاك (الدر على الشامى ٣/٢٤٩)

وَسَلَّمَ فَقَالَ :لَا قَيْلُولَةَ فِى الطَّلَاقِ (سنن سعيد بن منصور رقم ١١٣٠)

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ :طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ (مصنف عبد الرزاق رقم ١١٤٢١)

وفى الكافى : وطلاق المكره والسكران وخلعهما واعتاقهما واقع (تاتار خانية ٤/٣٩٥)

পক্ষান্তরে অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে তালাক দেওয়ার ঘটনাটি যদি লিখিত আকারে হয়। স্বামী বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে তালাক লিখে দেয় বা তালাকনামায় জোর করে স্বামীর দস্তখত নেওয়া হয়, মুখে তালাক উচ্চারণ না করা হয়। তবে এমন লেখা ও দস্তখত করার দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না।

وقيدنا بكونه على النطق لانه لو اكره على ان يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا (البحر الرائق ٣/٢٤٦)

ছিল। এ সুযোগে স্ত্রী একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসল। ছুরিটি তার গলায় ধরে বলল, আমাকে তিন তালাক দিয়ে দাও, নইলে তোমাকে জবাই করে ফেলব। লোকটি কাকুতি-মিনতি করে ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু স্ত্রী মানতে নারাজ। অবশেষে নিজের জান বাঁচাতে সে তিন তালাক উচ্চারণ করতে বাধ্য হলো। এরপর নবীজি (সা.)-এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করা হলে তিনি তালাক কার্যকর হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করলেন।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا فَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَتْ : لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا الْبَتَّةَ وَإِلَّا ذَبَحْتُكَ، فَنَاشَدَهَا اللَّهَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৮

মাওলানা কাসেম শরীফ

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের ইতিহাস

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের আগে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল, তা ছিল সে সময়ের সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্রিটিশরা আগমনের পর এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে নতুন সাজে সাজানোর নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ১৭৫৭ সাল থেকে ওই শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইংরেজরা ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য আদৌ মাথা ঘামায়নি। ১৭৯২ সালে সর্বপ্রথম মিস্টার অলিভার ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অবশেষে ১৮১৩ সালে ভারতবাসীদের শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনা ও সুপারিশ করার জন্য এক শিক্ষা কমিটি নিয়োজিত হয়। ১৮১৪ সালে কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য বড় লাটের নামে এক আদেশ জারি করা হয়। ১৮২৩ সালে গঠিত হয় শিক্ষা কমিটি। এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু কলেজগুলোকে উৎসাহ দানের প্রতি লক্ষ রাখা। ওই কমিটির মাধ্যমে এ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, তা ছিল মুসলিমদের জন্য প্রতিকূল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য ধর্ম সম্পর্কীয় প্রাথমিক জ্ঞান লাভের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এটা ছিল মুসলিমদের পক্ষে একটা অসহনীয় ব্যাপার। এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শুধু পার্থিব স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে রচিত।

এরপর ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই পরিষদের নিয়মাবলি ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কোনো মনীষার বাহনরূপে নয়, ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের সর্বময় প্রকাশ-মাধ্যমরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা গভীরভাবে জীবনের সঙ্গে গ্রোথিত হোক এবং তা ছড়িয়ে যাক সর্বস্তরে। লোকশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যে এ দেশের আর্থসামাজিক বিবিধ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব, এ বিশ্বাসে তিনি ছিলেন দৃঢ়মূল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (০৭ মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ-০৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) নেতৃত্বে শিক্ষা কারিকুলামে তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি। পরবর্তীতে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর মহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (০২ নভেম্বর, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ-৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) নেতৃত্বে গ্রহণ করা হয় বরদা পরিকল্পনা। এ গোটা পরিকল্পনা যে মৌলিক আদর্শ ও নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত, তার প্রধান দিকটি ছিল জাতির শিশুদের ভালো ব্যবসায়িক যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের দৃষ্টিতে মনুষ্যত্ব ও উপার্জনের যোগ্যতা সমার্থক শব্দ। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এ পরিকল্পনাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে যে এর মাধ্যমে যারা শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করবে, তারা নিরেট বস্তুবাদী হয়ে গড়ে উঠবে। বরদা শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দেওয়া হয়। বাদ দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী) বলেন, আমরা বরদা শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিয়েছি। কেননা আজকাল ধর্মীয় শিক্ষা যেভাবে দেওয়া হয় এবং যেভাবে তার বাস্তব অনুশীলন হয়ে থাকে, তাতে ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি হয়।' সব ধর্মকে বাদ দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর কথিত মানবতাবাদী ধর্মের শিক্ষা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়। কারণ এরপর যে বংশধর ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত হয়ে বের হবে, তাদের নৈতিক মত, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার উৎস হবে একমাত্র গান্ধীর মানবতাবাদী ধর্ম। এর ফলে পরবর্তী বংশধর, যারা বরদা পরিকল্পনাভুক্ত বিদ্যালয়সমূহ থেকে শিক্ষা লাভ করে বেরিয়ে আসবে, তাদের ওপর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা এত প্রবল হবে যে তারা নিজেদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার তেমন ধার ধারবে না। সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া যায়, তৃতীয় বংশধর পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভারত সত্যিকার অর্থে এক জাতিতে পরিণত হয়ে যাবে।

একই সময় মধ্য প্রদেশে অন্য একটি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, যা ছিল বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এর প্রণেতা ছিলেন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী মিস্টার শুকলা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের ৩০ শে জুলাই মিস্টার শুকলাকে সভাপতি করে পল্লী অঞ্চলে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা চালু করার উপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে। মধ্য প্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেস

সংসদীয় দল ৪ ডিসেম্বর পরিকল্পনাটির মঞ্জুরি দেয়। পরিকল্পনাকে মঞ্জুর করার পর যে সিলেবাস পরিষদ গঠিত হয়, মধ্য প্রদেশের একজন মুসলিমকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। টেক্সট বুক কমিটিতেও একজন মুসলিম রাখা হয়নি। ফলে মধ্য প্রদেশের শাসনাধীন মুসলিমদের আপন ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষার ব্যাপারে কিছুই বলার স্বাধীনতা রইল না। বরোদার বিদ্যামন্দিরগুলোর জন্য শিক্ষক তৈরির ব্যবস্থা নিতে একটা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়। উক্ত স্কুলে মুসলিমদের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। মধ্য প্রদেশের বিধানসভার সদস্য মৌলভী আবদুর রহমান সাহেব উক্ত ট্রেনিং স্কুল পরিদর্শনে গেলে দেখতে পান হিন্দু ও মুসলিম সকলেই ধুতি পরা। সেখানে সকল পাঠ্য বিষয় হিন্দি ও মারাঠি ভাষায় পড়ানো হয়। কেবলমাত্র উর্দু বর্ণমালা শেখানোর জন্য একজন মুসলিমকে নিয়োগ করা হয়েছে। মুসলিম ছাত্ররা সেখানে অস্পৃশ্যদের মতো থাকে, তারা আলাদা খাওয়াদাওয়া করে। পানি খাবার পাত্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না। প্রতিদিন বন্দে মাতরম সঙ্গীত দিয়ে স্কুল শুরু হয়। মুসলিম ছাত্রদের প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত জোড় করে ও মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়।

এ দুটি শিক্ষানীতিই ছিল মুসলিমদের বিপক্ষে। বরদা পরিকল্পনা ও বিদ্যামন্দির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি তোলা হয়েছে তার জবাবে অন্যান্য কথার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও বরাবর বলা হচ্ছে, যে দেশে বহুসংখ্যক ধর্মের অনুসারীরা বাস করে, সেখানে সবার ধর্মের শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র সাধারণ বৈষয়িক শিক্ষার ব্যবস্থাই করা যেতে পারে। আর সর্বজনীন শিক্ষা চালুর জন্য ব্যাপকহারে ধর্মহীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করার থাকে না। অথচ ইউরোপের যেসব সুসভ্য দেশে ধর্মের কোনোই গুরুত্ব নেই, সেসব দেশের মধ্যে ফ্রান্সসহ অন্যান্য দু-চারটা দেশ ছাড়া কোনো দেশই ভারতের মতো নীতি অবলম্বন করেনি। যেমন ইংল্যান্ডে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর আপন উদ্যোগে নিজস্ব বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় অধিকার রয়েছে। সরকারি শিক্ষা বিভাগ শুধু তার তদারক করে থাকে, এমনকি এ ধরনের বিদ্যালয়কে সরকার সাহায্যও দিয়ে থাকে। লিথুনিয়ার সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। কেবল যেসব ছেলেমেয়ের পিতামাতা ধর্মীয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক নয়, তারাই এর ব্যতিক্রম। তা ছাড়া সেখানেও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর নিজস্ব উদ্যোগে আপন বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার রয়েছে। সরকার তাদের এ শর্তে সাহায্য দিয়ে থাকে যে ওই সব বিদ্যালয়ে সরকারি শিক্ষানীতি অনুসারে বৈষয়িক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। পোল্যান্ডের যাবতীয় সরকারি বিদ্যালয়ে ও সরকারি আনুকূল্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন ধর্মের স্বীকৃত সমিতিগুলোকে আপন আপন ধর্মের অনুসারীদের জন্য পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও বিদ্যালয়গুলোতে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা তদারক করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা লাভের পর এতদাঞ্চলের জাতি ও রাষ্ট্র যেসব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তন্মধ্যে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল প্রধান। যার মৌলিক সমাধান হওয়া অপরিহার্য ছিল সর্বপ্রথম। কেননা একটা আদর্শবাদী দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে শিক্ষা সমস্যাই হয় জীবন-মরণের সমস্যা। বিশেষ করে এ কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে এ অঞ্চলের জনগণ যে শিক্ষাব্যবস্থা লাভ করেছিল, তার প্রতিষ্ঠা ও রূপকার ছিল তাদেরই প্রাক্তন প্রভু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। তারা এ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল তার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করার জন্য তিনটি কথা মৌলিকভাবে মনে রাখতে হবে। একটি হলো, ইংরেজ ছিল তখন পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার অগ্রণী। একটি বস্তুবাদী সাম্রাজ্যবাদী জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শনমূলক হবে; নিতান্ত বৈষয়িক ও উপস্থিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ এবং নীতিহীন ভোগবাদ ও স্বার্থবাদই হবে সে শিক্ষাব্যবস্থার মৌল দৃষ্টিকোণ। এটি খুবই স্বাভাবিক কথা যে এর ব্যতিক্রম ধারণামাত্র করা যেতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা হলো, ইংরেজ ছিল এ দেশের বিজয়ী প্রভু, মালিক-মুখতার। সেই প্রভুরা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের, যাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করেছিল, তারা ছিল তাদের বিজিত গোলাম। গোলাম জাতির জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা তারা স্বভাবতই চালু করতে পারে না, যা গোলামদের প্রভু বানিয়ে দিতে পারে কিংবা প্রভু হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে পারে। অন্য কথায়, গোলাম জাতিকে আরো গোলাম বানানোর উপযোগী শিক্ষাই তারা দিতে চেয়েছে, প্রভু বা স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা নিশ্চয়ই দিতে চায়নি। আর তৃতীয়ত, এ কথাও উপেক্ষণীয় নয় যে ইংরেজরা ছিল কট্টর খ্রিস্টান। তারা এই বিশাল অঞ্চলের রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল মুসলিমদের কাছ থেকে। আর এ রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সময় তারা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল কেবল মুসলিমদের তরফ থেকেই। এ কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিল

চরম মুসলিমবিদ্বেষী এবং মুসলিমদের ঘোরতর দুশমন। তারা স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিল, মুসলিমদের সংগ্রামী শক্তির উৎস যে জীবন-দর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থা, তাকে নিঃশেষে খতম না করা পর্যন্ত এই লোকদের ওপর ইংরেজ শাসনের মজবুত বুনিয়াদ কায়েম হতে পারে না।

তাই এ কথা পরিষ্কার, ইংরেজের প্রবর্তিত সে শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীন দেশ ও জনগণের জন্য কোনো দিক দিয়েই উপযুক্ত ছিল না। দেশ-বিভাগের পর তা এখানে এক দিনের জন্যও চালু থাকা উচিত ছিল না, বরং অনতিবিলম্বে সে শিক্ষাব্যবস্থা বদল করে এ দেশের জনগণের উপযোগী একটি আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু এ জাতির দুর্ভাগ্যই এখানে যে এ দেশে তা করা হয়নি। পাকিস্তান উত্তরকালে শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা নিশ্চিত ও নিষ্কণ্টক করার জন্যই দিন-রাত ব্যস্ত ছিল। মুসলিম জাতির আদর্শিক ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য অপরিহার্য ছিল যে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন, তার প্রতি একবিন্দু দৃষ্টি নিক্ষেপের ফুরসতও তাদের হয়নি, কিংবা বলা যায় ইংরেজের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধনেরই প্রয়োজন বোধ করেনি তারা এবং তা করতেও চায়নি। প্রয়োজন মনে করেনি এ কারণে যে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত সব লোকই ছিল ইংরেজের অনুরূপ জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট ও আস্থাবান। ফলে স্বাধীন দেশ ও জনগণের বেলায় যে তার ব্যতিক্রম কিছু হওয়া দরকার, তার চেতনাটুকু তাদের মনে জাগেনি। তারা এ কাজ করতে চায়নি এ জন্য যে তারা স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিল যে মুসলিম নাগরিকদের উপযোগী এবং তাদের আদর্শিক চেতনার অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশে চালু করা হলে তা শাসকদেরই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে।

পাকিস্তান-উত্তর যুগে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য যে কোনো চেষ্টাই হয়নি, তা অবশ্য বলা যাবে না। এ পর্যায়ে যা চেষ্টা হয়েছে, সংক্ষেপে তা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে সর্বপ্রথম একটি নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান কায়েমের চার বছর পর ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক এক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় অ্যাডভাইজারি বোর্ড, কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ডের এক যুক্ত অধিবেশন হয়। এরপর ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে কমার্শিয়াল এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। ১৯৫৫ সালে প্রথম রচিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা সম্পর্কেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে লাহোরে সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড একটি কমিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবাদি পেশ করে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সরকার শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করে ও তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৫৯ সালে ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আইয়ুব খান নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার গোটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করে দেশ ও জাতির প্রয়োজনের দৃষ্টিতে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা রচনার লক্ষ্যে একটি 'শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করে। এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সারা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতিকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালে এক আদেশে ডক্টর কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের সদস্যগণ ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাসব্যাপী এ সফরে কমিশনের সদস্যগণ সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে কমিশন সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই এটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কমিশনের সুপারিশমালায় বেশ কিছু সুপারিশ ছিল, যা প্রকৃতপক্ষে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও যুগোপযোগী এবং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কার বলা যায়। আবার সুপারিশমালার মধ্যে এমন কিছু মৌলিক দিক ও বিষয় ছিল, যা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত এবং জনগণের চিন্তা-চেতনা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধের পরিপন্থী।

প্রকৃতপক্ষে কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির উপযোগী ধর্মবোধ বিবর্জিত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। কমিশন নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করছে। কমিশন শিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে তাকে আদর্শিক দিক থেকে দুটি

ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–(১) সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির কর্মী তৈরি ও (২) ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাবিবর্জিত সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি ও তার আলোকে ব্যবহারিক জীবন গড়ে তোলা। এ পর্যায়ে সরকারের শিক্ষা যা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হয়েছে তা আগের চেয়ে অধিক মারাত্মকরূপে দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে দ্বীন-ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে এ রিপোর্ট হচ্ছে চরম কলঙ্কজনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক। যাহোক, এরপর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৬ সালে প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৭৮ সালে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এইচ এম এরশাদের আমলে ১৯৮৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর আব্দুল মজীদ খানের নেতৃত্বে 'মজীদ খান কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজুদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়ার আমলে কোনো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়নি। তখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার আমলে ডক্টর কুদরত-ই-খুদা রিপোর্টের' ভিত্তিতে প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার কায়েম হওয়ার পর ডক্টর মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞাকে চেয়ারম্যান করে 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩' গঠন করা হয়। এমনকি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচিত শেখ হাসিনার মহাজোট সরকারও যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে তার পুরোটাই ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের দেশের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে যে লেখাপড়া ('ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পর্যায়ের শিক্ষা) প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণই পশ্চিমা শিক্ষানীতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। আবার মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাতেও দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি 'কওমী' ধারা এবং অন্যটি তুলনামূলকভাবে আধুনিক 'আলীয়া' ধারা।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে উপরিউক্ত শিক্ষা কমিশন ও কমিটিসমূহের রিপোর্ট ও সুপারিশমালার কোনোটাই যথাযথ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আগের সরকারের আমলে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। ওই সব সুপারিশে যারা একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন, তাঁরা ধর্ম শিক্ষাকে বলতে গেলে বাদই দিয়েছেন। আর যাঁরা ধর্ম শিক্ষাকে বাদ দেননি, তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার লেজুড় হিসেবে রেখেছেন। এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি কথা বলাই যথেষ্ট এবং তা এই যে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থায় সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ গতানুগতিকতার প্রবল প্রাধান্য অপরিবর্তিতই রয়েছে। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে 'জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও আজ পর্যন্ত এখানে আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়নি।'

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

(৩৪পৃষ্ঠার পর)

তাঁর লিখিত বিভিন্ন ফাতওয়ার কপি এখনো দারুল উলূমের রেজিস্টারে সংরক্ষিত আছে। তিনি কিছুদিন (বেসরকারি) বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর্থিক লোভ-লালসা তাঁকে হক ও ন্যায়ের পথ থেকে মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি একদা দরসে বলেন, আমাকে এক লোক রাতের অন্ধকারে অনেক অর্থকড়ি দিয়ে তার পক্ষে রায় দেওয়ার আবেদন করে। তখন আমি খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিই। এটি কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই করেছিলাম। অন্যথায় তাতে পার্থিব অনেক সুবিধা গ্রহণের সুযোগ ছিল। আল্লাহ আমাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এই ঘটনা হযরতের বিমোহ ও খোদাভীরু হওয়ার জন্য প্রমাণ। সাথে তাঁর বিচারক থাকার বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, হযরত শায়খ আব্দুল হক আজমী (রহ.) জ্ঞান-গবেষণা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের এক আধার ছিলেন। তিনি উম্মতের মূলধন ও গৌরবের বস্তু ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র একজন ক্ষণজন্মা আলেমে রব্বানী ও মুহাদ্দিসে জলিল ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একসাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আমল-আখলাক, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা, চেষ্টা ও সাধনার এক মূর্তপ্রতীক এবং আযীমতের এক আলোকিত সূর্য। তাঁর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহজে শান্ত হওয়ার নয়। বরং তা এক দীর্ঘ ইতিহাস হয়ে থাকবে। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ–তিনি যেন তাঁর সকল পদস্খলন ক্ষমা করে আপন রহমতে বেষ্টন করে নেন এবং তাঁকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন, আমীন।

আহ্! দারুল উলূম দেওবন্দের একজন ক্ষণজন্মা মুহাদ্দিসের প্রস্থান

মাওলানা সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী

১ রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরী জুমাবার, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে এশিয়ার বৃহত্তম বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ 'দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত শায়খুল হাদীস, প্রখ্যাত আলেমে রব্বানী, যুগশ্রেষ্ঠ মুফতি, হযরত মাওলানা আব্দুল হক আজমী সাহেব এই নশ্বর পৃথিবী থেকে পরপারে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮৮ বছর। তাঁর ইন্তেকালে জ্ঞান-গবেষণার এক দীর্ঘ যুগের সমাপ্তি ঘটল।

দুঃখজনক ও মর্মস্পর্শী এই সংবাদ শ্রবণে অন্তরে প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি হলো সারা দুনিয়ার দ্বীনি হলকায়। তৈরি হলো অস্থির ভারাক্রান্ত এক করুণ পরিবেশ। দারুল উলূম দেওবন্দে দীর্ঘদিন ধরে তিনি বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের দরস দিতেন, তাই তাঁকে শায়খে ছানী বলা হতো।

হযরতের সাদামাটা জীবন, দরসপ্রীতি, অনুরাগের ভঙ্গিমা, পাঠ-পদ্ধতি, লৌকিকতাহীন সাধারণ পোশাক, সুমধুর ভাষা ও সুমিষ্ট আচরণ সকলকে আসলাফ ও আকাবেরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাঠদান পদ্ধতি, নিষ্ঠা ও খোদাভীতিতে তিনি ছিলেন অনন্য গুণের অধিকারী। তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধিতে তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সম্রাট। তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত তথা তাঁর দু'আ আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার কথা সর্বমহলে বিশ্রুত ছিল।

আলেম-ওলামা ও সাধারণ জনগণ সকলেই তাঁর মাধ্যমে দু'আ করাতেন এবং তাঁর কাছে দু'আ চাইতেন। দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে দু'আর জন্য আসতেন আবার বড় বড় দ্বীনি মজমা ও জলসায় তাঁকে দু'আর জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। তিনিও অত্যন্ত গুরুত্ব ও জোর দিতেন দু'আর প্রতি।

হযরত শায়খে ছানী (রহ.)-র শারীরিক অবয়ব :

তিনি ছিলেন লম্বা শরীরবিশিষ্ট, লাল-কালো বর্ণের প্রশস্ত ললাট, মধ্যম আকৃতির চোখ এবং ভারসাম্যপূর্ণ দেহের অধিকারী। ঘন দাড়ি। তাকওয়া ও খোদাভীতির নূর চমকাতো তাঁর মুখায়ববে।

তাঁর পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব তুলে ধরতে গিয়ে হযরতের একজন বাংলাদেশি শিষ্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁর রচিত "আল কালামুল মুফিদ" কিতাবে লেখেন,

هوعالم كبيرذكى فطين ورع زاهد وله فى التدريس مزية قلمايفوت عنه حديث لايبين فيه شئيامن الفوائد والتوضيح.

অর্থ : "তিনি হলেন প্রতিভাবান, মেধাবী, বিচক্ষণ, খোদাভীরু একজন শীর্ষ আলেম। হাদীস শরীফ পাঠদানে তাঁর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। কোনো হাদীস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া তাঁর দরসে বাদ পড়ে না।"

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা :

এই মহামনীষী ১৯২৮ ইংরেজি মোতাবেক ১৩৪৫ হিজরী, রজব মাসের এক রবিবারে ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার জোগিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের একটি মক্তবে সমাপ্ত করেন। অতঃপর "বায়তুল উলুম সারায়ে-মীর"-এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি আরবী-ফারসীর বিভিন্ন কিতাবের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর তিনি 'দারুল উলূম মৌ' এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি মেশকাত শরীফ পর্যন্ত তা'লীম হাসিল করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের তৃষ্ণা নিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস শরীফ সমাপ্ত করেন। সেই সুবাধে তিনি আযাদী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক, শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর কাছ থেকে বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের দরস গ্রহণ করে সৌভাগ্যমণ্ডিত হন এবং শামায়েলে তিরমিযী, আবু দাউদ শরীফের দরস হাসিল করেন আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী (রহ.)-এর কাছ থেকে। সুনানে নাসাঈ, মুআত্তা মালেক এবং ত্বহাবী শরীফের দরস লাভ করেন আল্লামা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী (রহ.) থেকে। শায়খ জহুর আহমদ দেওবন্দী (রহ.)-এর কাছ থেকে সুনানে ইবনে মাজাহের দরস গ্রহণ করেন। শায়খ জলীল আহমদ (রহ.)-এর কাছ থেকে মুয়াত্তা মুহাম্মাদের পাঠ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি মুহাদ্দিসে কবীর আল্লামা হাবিবুর রহমান আজমী (রহ.)-এর পক্ষ থেকে "সিহাহ সিত্তা" এবং "আওয়ায়েলে সাঈদ ইবনে সাম্বল"-এর ইজাযতপ্রাপ্ত হন। হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.)-এর পক্ষ থেকেও হাদীসের ইজাযত পেয়ে ধন্য হন তিনি।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মেধা, ধীশক্তি, অধ্যাবসায়, তাকওয়া, উন্নত চরিত্র ইত্যাদি গুণাবলি উস্তাদ এবং সাথীদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল।

শিক্ষকতা ও কর্মজীবনে পদার্পণ :

বিভিন্ন শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি দ্বীনি খেদমাত তথা ইলমে নববীর পাঠদানকেই একমাত্র কর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে তিনি সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ষোল বছর পর্যন্ত 'বানারসের' প্রসিদ্ধ মাদরাসা 'মাতলাউল উলুম'-এ দরসে নেজামীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কিতাবাদীর দরস প্রদান করেন। অতঃপর কিছুদিন বিহার প্রদেশের 'গরিড়িহা' জেলার 'কোলডিহা' গ্রামে অবস্থিত 'মাদরাসা হুসাইনিয়ায়' উস্তাদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর কিছুদিন তিনিদারুল উলূম মৌ-এ ইলমে নববীর খিদমাত আঞ্জাম দেন। ১৯৮২ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সর্বসম্মতিতে দারুল উলূম দেওবন্দে বুখারী শরীফের দরস প্রদান করার জন্য হযরতকে আনার সিদ্ধান্ত হয়। তখন থেকে ইন্তেকালের আগমুহূর্ত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তিনি বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের দরস প্রদান করেন।

পাঠদান পদ্ধতি :

হযরত শায়খে ছানী (রহ.)-এর দরস হযরত মাদানী (রহ.)-এর দরসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হযরত মাদানী (রহ.)-এর বিপ্লবী ভঙ্গিমা তাঁর বুখারী শরীফের কিতাবুল মগাজীতে অধিকাংশ সময় পরিলক্ষিত হতো। তাঁর দরসে স্পষ্ট ফুটে উঠত যে নববী জিহাদের বিপরীত শরীয়তবহির্ভূত বিপ্লবী কর্মপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তিনি দরসে গোটা সমুদ্রকে পাত্রে নিয়ে আসতেন। অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়কে সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা সমাধান করে দিতেন। তাঁর দরস ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ, সহজ-সরল। যখন কোনো যুদ্ধের বর্ণনা দিতেন মনে হতো তা এখনই সংঘটিত হচ্ছে। যখন কোনো স্থান বা দেশের বিবরণ দিতেন তখন মনে হতো শ্রোতাগণ তাদের চোখের সামনেই তা অবলোকন করছে। তাঁর দরস এত মধুর ছিল যে হযরতের জবান থেকে যে ব্যাখ্যা ও সমাধান বের হতো তা আমাদের স্মৃতিতে রেখাপাত করত। বিশেষত তিনি ইলমে হাদীস অর্জনকারী ছাত্রদের জন্য অপরিহার্য শর্তাবলি ও নিয়মাবলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। বুখারী শরীফের প্রথম দরসেই হাদীসের ইলম অর্জনকারী ছাত্রদের জন্য যে সকল শর্ত স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর ছাত্রদের দিতেন তা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং এগুলোর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করার জন্য জোর তাগিদ দিতেন।

তিনি বলেন, একদা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট ওলিদ বিন ইবরাহীম নামক একজন ছাত্র ইলমে হাদীস অর্জন করার আগ্রহ প্রকাশ করলে ইমাম বুখারী (রহ.) তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেন, যা আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) "তাদরীবুর রাবী" কিতাবে উল্লেখ করেন। হযরত শায়খে ছানী (রহ.) তা আমাদের শুনিয়ে তার ব্যাখ্যা করেন। ছাত্রদের উপকারার্থে নিম্নে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। মূলত কাজী ওলীদ বিন ইবরাহীম ছিলেন একজন বিচারক। তিনি হঠাৎ ইলমে হাদীস অর্জন করার প্রতি আগ্রহী হলেন। অতি শওক ও আগ্রহ নিয়ে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দরবারে হাজির হয়ে ইলমে হাদীস অর্জন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন ইমাম বুখারী (রহ.) তাকে ইলমে হাদীস অর্জন করার শর্তসমূহ এবং এই শর্তগুলো মেনে ইলমে হাদীস অর্জন করার ফজীলত ও মর্যাদার বিবরণ দেন। ইমাম বুখারী (রহ.) ওলীদকে লক্ষ করে বলেন,

واعلم أنَّ الرَّجُل لا يصير مُحدِّثًا كاملاً فى حديثه إلَّا بعد أن يكتب أربعًا ,مع أربع ,كأربع ,مثل أربع ,فى أربع , عند أربع ,بأربع ,على أربع ,عن أربع ,لأربع ,وكل هذه الرُّباعيات لا تتم إلَّا بأربع ,مع أربع ,فإذا تمَّت له كلها ,هان عليه أربع ,وابتلى بأربع , فإذا صبر على ذلك أكرمه الله فى الدُّنيا بأربع ,وأثابه فى الآخرة بأربع.(تدريب الراوى ٢/٥٨)

অর্থাৎ এই সকল (রুবা-ইয়্যাত) চতুর্গুণ ব্যতীত কখনো কেউ কামেল মুহাদ্দিস হতে পারেন না। যদি কোনো ব্যক্তি এই বারো রুবাইয়্যাত (চতুর্গুণ) তথা আটচল্লিশটি বস্তু পূর্ণভাবে পালন করবে, অর্থাৎ তা যার ভাগ্যে জুটবে তার জন্য চারটি বস্তু তুচ্ছ মনে হবে। তখন চারটি বস্তু দ্বারা তাকে পরীক্ষা করা হবে। অতঃপর যখন এই চারটি বস্তুর ওপর ধৈর্যধারণ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পৃথিবীতে চারটি পুরস্কার দ্বারা ধন্য করবেন এবং আখেরাতে চারটি পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করবেন। কাজী ওলীদ বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট তার ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি এই চতুর্গুণের ব্যাখ্যা পেশ করলেন।

১. ইলমে হাদীস অর্জন করার জন্য চারটি বস্তু লিখতে হবে : (ক) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসসমূহ লেখা, (খ) সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনাগুলো লেখা, (গ) তাবেঈগণের বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ করা ও (ঘ) পরবর্তী ওলামায়ে

কেরামগণের বিবরণ ও ইতিহাস লেখা।
২. চারটি বস্তুর সহকারে লেখা : (ক) বর্ণনাকারীর নামসহ হাদীস লেখা, (খ) তাদের উপনাম সহকারে হাদীস লেখা, (গ) তাদের জন্মস্থান লেখা ও (ঘ) তাদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ লেখা।
৩. চারটি বস্তুকে সাথে করে হাদীস অর্জন করতে হবে : (ক) বক্তব্যে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা পাঠ করা, (খ) উসিলা দিয়ে দু'আ করা, (গ) বিসমিল্লাহ সহকারে সূরা পাঠ করা ও (ঘ) নামাযের পর তাকবীর পাঠ করা।
৪. চার প্রকারের হাদীস জানতে হবে : (ক) মুসনাদ, (খ) মুরসাল, (গ) মাওকুফ ও (ঘ) মাকতু।
৫. বয়সের চার স্তরে হাদীস অর্জন করতে হবে : (ক) শৈশব ও কম বয়সে, (খ) কিশোর ও যৌবনকালে, (গ) অর্ধ বয়সে ও (ঘ) বৃদ্ধাবস্থায়।
৬. চার অবস্থায় হাদীস অর্জন করবে : (ক) অবসরে, (খ) ব্যস্ততার মধ্যে, (গ) দরিদ্র অবস্থায় ও (ঘ) সচ্ছল অবস্থায়।
৭. চার স্থানে হাদীস অর্জন করবে : (ক) পাহাড়-পর্বতে, (খ) নদী-সমুদ্রে, (গ) শহর-বন্দরে ও (ঘ) বন-জঙ্গলে।
৮. চারটি বস্তুর ওপর লিখতে হবে : (ক) পাথরের ওপর, (খ) পাত্রের ভাঙা টুকরার ওপর, (গ) চামড়ার ওপর ও (ঘ) হাড্ডির ওপর [যদি কাগজে লেখার সুযোগ না হয়]
৯. চার ব্যক্তি থেকে হাদীস লিখবে : (ক) নিজের চেয়ে বয়সে বড়দের কাছ থেকে, (খ) নিজের সমবয়স্কদের কাছ থেকে, (গ) নিজের চেয়ে বয়সে ছোটদের কাছ থেকে ও (ঘ) নিজের পিতা-মাতার কিতাবাদী থেকে। (শর্ত হলো, লেখাটি তাঁদের হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান হতে হবে)।
১০. চারটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইলমে হাদীস অর্জন করবে : (ক) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে , (খ) পবিত্র কোরআন মজিদের ওপর আমল করার জন্য, (গ) ইলম পিপাসুদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ও (ঘ) কিতাবাদী রচনা করার ব্রতী হয়ে, যেন মৃত্যুর পরও তার স্মরণ অবশিষ্ট থাকে।
১১. এই দশম চতুর্গুণ, অন্য দুই চতুর্গুণ ব্যতীত পূর্ণ হয় না : (ক) লিখন পদ্ধতিতে পারদর্শী হওয়া, (খ) ইলমে লুগাত তথা আভিধানিক জ্ঞান অর্জন করা, (গ) ইলমে নাহু বা আরবী ব্যাকরণ জানা ও (ঘ) ইলমে ছরফ বা আরবী ভাষার শব্দ গঠন-পদ্ধতি জানা থাকা।
১২. খোদাপ্রদত্ত চার গুণের সাথে : (ক) শক্তি, (খ) সুস্থতা, (গ) আগ্রহ ও (ঘ) মেধাশক্তি।
যখন এই বারো চতুর্গুণ অর্থাৎ আটচল্লিশটি বস্তু অর্জন করে কোনো ছাত্র ধন্য হবে তখন তার নিকট চারটি বস্তু তুচ্ছ মনে হবে।
১৩. চার তুচ্ছ বস্তু : (ক) স্ত্রী ও পরিবার, (খ) ধন-সম্পদ, (গ) ছেলে-সন্তান ও (ঘ) ঘরবাড়ি।
অতঃপর সে চারটি বস্তু দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।
১৪. পরীক্ষার চার বস্তু : (ক) শত্রুর পক্ষ থেকে শত্রুতা, (খ) বন্ধুদের পক্ষ থেকে নিন্দা, (গ) অজ্ঞদের পক্ষ থেকে আঘাত ও (ঘ) জ্ঞানীদের পক্ষ থেকে হাসদ ও হিংসা।
১৫. তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে চারটি পুরস্কার দ্বারা ধন্য হবেন : (ক) অল্প তুষ্টির সম্মান, (খ) ভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মর্যাদা, (গ) জ্ঞানের স্বাদ ও (ঘ) অশুভ জীবনযাপন থেকে মুক্তি। এবং
১৬. আখেরাতে চারটি পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করবেন : (ক) নিজের আত্মীয়স্বজন ও সম্পর্কীয় যেকোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবে, (খ) আরশের নিচে ছায়া পাবে, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, (গ) হুজুর (সা.)-এর হাওজে কাওসার থেকে যাকে চাইবে পানি পান করাতে পারবে ও (ঘ) জান্নাতের উঁচ্চ স্থানের অধিকারী হয়ে নবীগণের প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী হবেন।
অতঃপর ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমি যা আমার উস্তাদগণের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে শুনেছিলাম তা তোমাকে একত্রে শুনিয়ে দিলাম। এখন তোমার ইচ্ছা, তুমি এ সকল শর্তপূরণ করে ইলমে হাদীস অর্জন করো, অথবা অন্য ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করো।
হযরত শায়খে ছানী (রহ.) ছাত্রদের তা শুনিয়ে বলতেন, যদি এই গুণগুলো অর্জন করতে সক্ষম হও তাহলে তোমরাও ইনশাআল্লাহ কামেল-মুহাদ্দিস হতে পারবে এবং দুনিয়া-আখেরাতে সফলকাম হতে পারবে। তাই এই গুণগুলোর প্রতি খুবই মনোনিবেশ করবে এবং তা দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ সকলকে তাওফিক দান করুন, আমীন।

দরসের প্রতি আসক্তি :

হযরত শায়খে ছানী (রহ.)-এর জীবনে পাঠদান ও দরস প্রদানের প্রতি খুবই আসক্তি ও প্রবল ঝোঁক ছিল। দরসপ্রীতি তাঁর জীবনে এভাবে সংযুক্ত হয়েছিল যে তা ব্যতীত তাঁর জীবনকে কল্পনা করা যায় না। যেমনি ফুলকে সুগন্ধি ব্যতীত এবং নক্ষত্রকে রশ্মি ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। দরসের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ছাত্রদের বলতেন, আমি জীবনে শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোনো পেশা

গ্রহণ করিনি। আমার আশা, এমনি পড়াতে পড়াতে প্রিয় প্রভুর সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করব, ইনশাআল্লাহ। তাই তিনি শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল ও বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরসের খুবই গুরুত্ব দিতেন। নিজে নিজে চলতে সক্ষম ছিলেন না, হুইল চেয়ারে করে দারুল হাদীসে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে বুখারী শরীফের দরস প্রদান করতেন। যেহেতু বুখারী শরীফ কেবলমাত্র দরসে পড়িয়ে শেষ করা সম্ভব নয়, তাই তিনি কষ্ট সহ্য করে বৃদ্ধাবস্থায় আসরের পরও বুখারী শরীফের দরস প্রদান করতেন। সাথে সাথে দারুল ইফতার ছাত্রদের শরহে আশবাহ ওয়ান্নাজায়ের পড়াতেন। অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় দরস প্রদান করতেন। সর্বস্তরের ছাত্ররা তাঁর দরস থেকে উপকৃত হতে পারত।

হযরত শায়খে ছানী (রহ.)-এর সাদামাটা জীবন :

একদা কিছু ছাত্র একযোগ হয়ে দরস না করার কৌশল করল। তারা দরসের পূর্বে হযরত শায়খে ছানী (রহ.)-এর ঘরে গেল এবং একজন বলল, হযরত! মনে হয় আজ আপনার শরীর ভালো না। কিছুক্ষণ পর অপরজন বলল, জি হযরত, আপনার মুখাবয়ব তা-ই সাক্ষ্য দিচ্ছে। তখন হযরত বলে উঠলেন, হ্যাঁ ভাই, সকাল থেকে একটু একটু দুর্বলতা অনুভব করছিলাম। তখন অন্য ছাত্র বলল, হযরত! আজ দরসে না গেলে ভালো হয়। কারণ শরীরের গুরুত্ব দিতে হবে, সুস্থতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তখন হযরত বললেন–ঠিক আছে, যখন তোমরা বলছো তাহলে আজ দরসে যাব না। মূলত ছাত্ররা করেছিল দুষ্টামি কিন্তু হযরত নিজ শরাফতের কারণে তা বাস্তব মনে করে নিলেন। কতই না সাদামাটা ছিল তাঁর জীবন! যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বাস্তব মূর্তপ্রতীক-

المومن غر كريم والمنافق خب لئيم

"মু'মিন সাদামাটা ও সম্ভ্রান্ত হয় আর মুনাফিক প্রতারক ও দুষ্ট হয়।"

খেদমতের জন্য অভিজ্ঞতা :

হযরত শায়খে ছানী (রহ.) বাংলাদেশি ছাত্রদের খুব বেশি মুহাব্বত করতেন। একদিন আমরা কজন বাংলাদেশি ছাত্র একত্রে হযরতের সুহবতে গেলাম। খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র তিনি আমাদের খোঁজখবর নিলেন। হযরত সেদিন খুব বেশি ক্লান্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে রোযা অবস্থায় তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছিল। হযরতের নিকট আবেদন জানালাম–হযরত, একটু মাথায় তেল দিই? তখন হযরত বলেন, তুমি কি তেল দিতে জানো? মানে, একটু আশ্চার্যান্বিত হলাম। তেল-মালিশ করাও আবার শিখতে হয় বুঝি? তবে শান্ত হয়ে বললাম–জি, হযরত। তখন তিনি বলেন, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল হালীম বুখারী সাহেবকে কখনো তেল লাগিয়েছো? আমি বললাম–জি, হযরত। তখন তাঁর মাতায় তেল লাগানোর অনুমতি দিলেন। আমি বললাম, হযরত! তেল লাগানোও কি শিখতে হয়? তিনি বলেন–হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি যদি পূর্বে কারো খেদমত না করে থাকো তাহলে আমার বৃদ্ধ বয়সে খেদমত করে শান্তিদানের পরিবর্তে আমার কষ্টের কারণ হবে। যা তোমার উপকারের বদলে ক্ষতি হয়ে যাবে। এ জন্য প্রথমে শিখবে তারপর খেদমত করবে।

ইলমী স্মরণিকা :

এই মহামনীষী উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শত-সহস্র শিষ্য রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আলেম-ওলামা, মুবাল্লিগ ও দ্বীনের দাঈ এবং লেখক-গবেষক, মুফতি ও মুহাদ্দিস রয়েছেন। যা হযরতের জন্য ছদকায়ে জারিয়া হিসেবে কাজ দেবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বুখারী শরীফের একটি টীকা লিখেছেন। যা প্রকাশিত হয়নি। আমাদের আশা, হযরতের এই মূল্যবান কাজটি সংশ্লিষ্টগণ এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাতে হযরতের এই ইলমী গবেষণা থেকে জাতি উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবে।

বংশীয় স্মৃতি :

হযরতুল উস্তাজ শায়খে ছানী (রহ.) তিনজন সৌভাগ্যবান মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম শাদি হয়েছিল আজমগড় জেলার ফুলফুরের পার্শ্ববর্তী বসিয়া গ্রামের অধিবাসী একজন ভদ্র মহিলার সাথে। ওই ঘরে হযরতের দুই মেয়ে "সায়্যিদা" ও "আনিসা" এবং এক ছেলে "আব্দুল হাকিম" জন্ম লাভ করেন। তাঁরা এখন মুম্বাইয়ে বসবাস করছেন। দ্বিতীয় বিবাহ করেন "ননদওয়া" গ্রাম থেকে, সে ঘরে হযরতের এক মেয়ে "আমাতুল্লাহ" জন্ম লাভ করেন। ধারাবাহিকভাকে এই দুই স্ত্রীর মৃত্যুর পর হযরত শায়খে ছানী (রহ.) বানারস থেকে একটি শাদি করেন। ওই ঘরে হযরতের ছয় ছেলে রয়েছে। আব্দুল-বর, আব্দুত তাওয়াব, আব্দুল মুনয়িম, আব্দুল মুতআল, আব্দুল মুকতাদির, সর্বকনিষ্ঠ ছেলে হলো আহমদ। প্রথম ছেলে একজন বিজ্ঞ ও উল্লেখযোগ্য আলেমে দ্বীন।

ইফতা ও কাজি :

হযরত শায়খে ছানী (রহ.) দরসের সাথে সাথে কিছুদিন ফিকাহ-ফাতওয়ার কাজও আঞ্জাম দিয়েছেন।

(বাকি অংশ ৩০ পৃ.দ্র.)

বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীন আল্লামা সলীমুল্লাহ খান (রহ.)

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

বিশ্বখ্যাত আলেমে দ্বীন, কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড তথা বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের সভাপতি, জামিয়া ফারুকিয়া করাচির প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক শায়খুল হাদীস আল্লামা সলীমুল্লাহ খান গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ ইং রবিবার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করাচির জামিয়া ফারুকিয়ায় ১৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জামিয়া ফারুকিয়ার কবরস্থানেই তাঁকে করা হয়।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান (রহ.) ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬ ইংরেজিতে ভারতের মুজাফফরনগর, হাসনপুর লোহারী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন পাকিস্তানের কবায়েলী এলাকা খাইবর এজেন্সির বাসিন্দা। যে এলাকা বর্তমানে তীরার পার্শ্ববর্তী চূরা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি আফরীদী পাঠানের একটি গোত্র মালিক দিন খায়লের বংশধর। তাঁর পিতা হলেন জনাব আব্দুল আলীম খান সাহেব।

হযরতের জন্মস্থান ছিল হাসানপুর লোহারী ঐতিহ্যগতভাবে বড় বড় আকাবেরদের বাসস্থল। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.), হাফেজ জামেন শহীদ (রহ.) এবং মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ থানভী (রহ.)-এর পীর ও শায়খ এবং হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর অতীব স্নেহভাজন মিয়াজি নূর মুহাম্মদ সাহেব ওই এলাকাতেই পুরো জীবন অতিবাহিত করেন। থানাভনের উল্লিখিত তিন মহামনীষী উক্ত এলাকায় যাতায়াত করে হযরত মিয়াজি সাহেবের কাছ থেকে ফয়জ হাসিল করতেন।

শিক্ষা :

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন মুনশী বান্দা হাসান (রহ.)-এর কাছে। তাঁর কাছে উর্দু-ফারসি শিক্ষা অর্জন করেন। আরেকজন উস্তাদ ছিলেন মুনশী আল্লাহ বান্দা। যাঁর কাছে তিনি উর্দু-ফারসি এবং পবিত্র কোরআনের নাজেরা পড়েন।

প্রাথমিক নাজেরা শেষ করা পর তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর প্রখ্যাত খলীফা মাওলানা মসীহুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মিফতাহুল উলূম মাদরাসায় চলে যান। সেখানে তিনি আড়াই বছরে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ শেষ করেন। ১৯৪২ ইং সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ এবং উচ্চতর শাস্ত্রসমূহের পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি দাওরায়ে হাদীসে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তালেবী ইলমী জীবনের সমাপ্তি ঘটান। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর।

ছাত্রাবস্থায় তিনি মাদরাসার বন্ধসমূহ বিশেষ করে রমাজান মাসে পবিত্র কোরআন হিফজ করার মনস্থ করেন। বিভিন্নজন পরামর্শ দিলেন, প্রতিদিন পারার এক-চতুর্থাংশ মুখস্থ করতে থাকো। এই নিয়মে তিনি কোরআন হিফজ করা আরম্ভ করেন। ৭-৮ পারা মুখস্থ করার পর দেখা গেল দৈনিক এক পারাই মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই তিনি কিছুদিনের মধ্যেই পুরো কোরআন শরীফ হেফজ করে ফেলেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের পুরোধা শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন মাদানী (রহ.) ও শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ হযরত মাওলানা ইজাজ আলী (রহ.) প্রমুখের কাছ থেকে ইলমী এবং রূহানী ফয়জ হাসিল করেন। তিনি উস্তাদদের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি সর্বপ্রথম নিজ উস্তাদ হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে জালালাবাদ মিফতাহুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কর্মজীবনের শুভসূচনা করেন। এই যাত্রায় প্রায় আট বছর উক্ত মাদরাসায় উলূমে নববীর খিদমাতে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকেন। তাঁর ইলমী, ইসলাহী ও তারবিয়াতী তত্ত্বাবধান পেয়ে ছাত্ররা খুবই যোগ্য এবং ইলমী ময়দানে দক্ষ হতে থাকে। ফলে উক্ত মাদরাসার গ্রহণযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্রুতি এবং খ্যাতি অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওই মাদরাসার ছাত্ররা দারুল উলূম দেওবন্দেও কৃতিত্বের নজির স্থাপন করে। কিছুদিনের মধ্যেই হযরত সলীমুল্লাহ খান সাহেব যোগ্য, দক্ষ এবং আন্তরিক মুদাররিস হিসেবে তাঁর উস্তাদদের মধ্যেও পরিচিত হয়ে যান। আট বসরের সফল মেহনতের পর শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শিবিবর আহমদ উসমানী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম টন্ডওয়ালা

সিন্দ-এ মুদাররিস হিসেব নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে তিনি পাকিস্তান চলে যান। সেখানে তিন বছর যাবৎ তাদরীসী খিদমাত আঞ্জাম দেন। অতঃপর পাকিস্তানের প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম করাচিতে মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দশ বছর যাবৎ তথায় হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ইসলামের ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, সৌরবিদ্যা এবং আরবী সাহিত্যের জটিল থেকে জটিল কিতাবাদী পাঠদানে নিয়োজিত থাকেন। দারুল উলূম থাকা অবস্থায় হযরত আল্লামা মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী সাহেব (রহ.)-এর অনুরোধে অবসর সময়ে জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউনে সবক পড়ানোর জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

হযরত (রহ.)-এর ফিতরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক আশ্চার্য দ্বীনি জযবা দান করেছিলেন। যার কারণে এত তা'লীমী খিদমাত আঞ্জাম দেওয়ার পরও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা তাঁকে আন্দোলিত করত। যেখানে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টা করতেন তিনি। জানুয়ারি ১৯৬৭ ইং মোতাবেক শাওয়াল ১৩৮৭ হিজরী সনে তিনি পাকিস্তানের নামকরা দ্বীনি বিদ্যাপীঠ জামিয়া ফারুকিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং এখলাসের ফলে খুব কম সময়েই প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে মাদরাসা থেকে জামিয়ার রূপ নেয়। দেশ-বিদেশে এখন তা একটি নামকরা ইসলামী বিদ্যাপীঠ বা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই পরিচিত।

তাঁর যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা এবং মুরব্বিয়ানার ওপর ভিত্তি করে তাঁকে অল পাকিস্তান কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অর্থাৎ বেফাকুল মাদারিস পাকিস্তানের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮০ ইং সালে তিনি এই শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তাতেও বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং যুগ চাহিদা অনুযায়ী বহু নিয়মনীতি ও আদর্শ-পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটান।

বিশেষ করে পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অনেক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। একসময় বেফাকের অধীনে শুধু দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। হযরত সলীমুল্লাহ খান সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আরো কয়েকটি জমা'আতের পরীক্ষা বেফাকের অধীনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সূচারুরূপে এর ব্যবস্থা করেন। ওসব জামা'আতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সনদও জারি করা হয়। সরকারের সাথে দীর্ঘদিন আলোচনার একপর্যায়ে সরকার কোনো শর্ত ছাড়াই এই বোর্ডের অধীনে কওমী মাদরাসাসমূহের সনদের স্বীকৃতি প্রদান করে। সনদের স্বীকৃতি হওয়ার পূর্বের ফারেগীনের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তাঁদের সনদেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এর ফলে তথাকার সকল কওমী মাদরাসার নেসাবে তা'লীম তথা শিক্ষা কারিকুলাম এক ও অভিন্ন হয়। মাদরাসাগুলো পরিচালনা, ছাত্রদের তারবিয়াতী পদ্ধতিসহ সব কিছুতে একটি অভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পাকিস্তানে কওমী মাদরাসাগুলোতে ভিন্ন নজরিয়া ও মাসলাকের চারটি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এর ওপর আছে প্রত্যেক বোর্ড থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি সম্মিলিত কমিটি। হযরত সলীমুল্লাহ খান সাহেব (রহ.) এই সম্মিলিত বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। যেকোনো যৌথ বিষয় উক্ত সম্মিলিত কমিটির পরামর্শক্রমে সমাধান করা হয়ে থাকে। পুরো পাকিস্তানে কওমী মাদরাসাভিত্তিক এসব খেদমাতে হযরত (রহ.) বিশাল অবদান ও মেহনত অনস্বীকার্য।

হযরতের দরস ও তাদরীস পাঠ-পদ্ধতি ছিল চমৎকার। অত্যন্ত গবেষণাপূর্ণ ও তাহকীকী তাকরীরে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর দরস। তিনি দীর্ঘদিন বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন। তাঁর তাকরীরগুলো একত্রিত করে সংকলন করা হয়েছে কাশফুলবারী নামে বুখারী শরীফের একটি অনবদ্য অনন্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ। যা থেকে উপকৃত হচ্ছে পুরো দুনিয়ার ইলমী হলকা। তেমনি তিনি দীর্ঘদিন মিশকাত শরীফের দরস দিয়েছেন। তাকরীর সংকলন করে মিশকাত শরীফেরও একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নফহাতুত তানকীহ নামে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইলমী হালকায় খুবই সাদৃত।

এককথায় তিনি উপমহাদেশের হাজার হাজার উলামার উস্তাদ ছিলেন। তাঁর পুরো জীবনের মেহনতের ফসল ছাত্ররা সমগ্র বিশ্বের ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অন্যান্য দ্বীনের খেদমাত থেকে মুসলমানগণ উপকৃত হচ্ছেন। আজ তিনি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তাঁর এই খিদমাত কিয়ামত তক সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মর্যাদা দান করেন, আমাদের মাঝে তাঁর স্থলাভিষিক্ত যোগ্য লোক তৈরি করে দেন, তাঁর পরিবার, পরিজন, ছাত্র, ভক্ত–সকলকে সবরের তাওফীক দান করেন। আমীন।

রাসূল করীম (সা.)-এর জন্মতারিখ :
বিচার-বিশ্লেষণ–সংশয়-সন্দেহের অপনোদন

মুফতী রেজাউল হক : শায়খুল হাদীস : দারুল উলূম যাকারিয়া দ.আফ্রিকা
অনুবাদ : মুফতী আতীকুল্লাহ

(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্ম কোন বছরে, কোন মাসে, কোন দিনে, কখন ও কোন জায়গায় হয়–এ নিয়ে কার কী মত? বিশুদ্ধ মতামত কোনটি? বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচন-পর্যালোচনা করা হয়েছে।)

মুহাক্কিক ও গবেষকদের মতে, ৯ ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার আনুমানিক ভোর ৪টা ৪০ মিনিটে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমনে পৃথিবী চির ধন্য হয়।

জন্মের বছর : রাসূল করীম (সা.)-এর শুভাগমন হয় 'আমুল ফিল'-এ তথা অভিশপ্ত আবরাহা তার বিশাল হাতি বাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফের ওপর যে বছর আক্রমণ করে, সেই বছরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুভ জন্মলাভ করেন। এই বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক ও সীরাত প্রণেতাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৩২১; ছিফাতুস সাফওয়াহ, ১/৫১; আর-রাওযুল আনফ ১/২৭৬)

হাতি বাহিনীর অভিযানের কয় দিন পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবির্ভাব ঘটে তা নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, তবে যে মতটি সর্বাধিক প্রচলিত ও অধিক প্রসিদ্ধ তা হলো, পঞ্চাশ দিন পরে রাসূল (সা.) আবির্ভূত হন।

হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন,

ولد عام الفيل ...فقيل بعده بشهر ...وقيل :بخمسين يوما، وهوأشهر

"জন্ম লাভ করেন 'আমুল ফিল'-এ। কেউ কেউ বলেন, ঘটনার এক মাস পরে; আর কেউ কেউ বলেন, পঞ্চাশ দিন পরে, আর এই মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ।" (আল-বিদায় : ২/৩২১)

জন্ম মাস : কোন মাসে জন্ম লাভ করেন? এ বিষয়ে বহু মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা কাসতলানী (রহ.) (মৃ. ৯২৩ হি.) ছয়টি মত উল্লেখ করেছেন। যথা–১. মুহাররম, ২. ছফর, ৩. রবিউল আউয়াল, ৪. রবিউল আখের, ৫. রজব, ৬. রমাজান। তবে জমহুর (সংখ্যাগুরু ঐতিহাসিকগণ) এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণ রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছে।

হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন,

ثم الجمهور على أنه كان فى شهر ربيع الأول

"অতঃপর জমহুর একমত হয়েছেন রবিউল আউয়াল মাসের ওপর।" (আল-বিদায়া ২/৩২০)

বিশ্বনন্দিত প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন আল্লাম মুহাম্মদ যাহেদ কাউসারী (রহ.) বলেন, রবিউল আউয়াল ব্যতীত অন্য মাসে জন্ম লাভ করার মতামতটি বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তা ভুলক্রমে কারো কলমে চলে এসেছে হয়তো। (মাকালাতে কাউছারী, পৃ. ৪০৫)

জন্মদিন :

কোন দিনটিতে জন্ম লাভ করেন? এ কথাই সকল ঐতিহাসিক একমত যে রাসূল (সা.)-এর জন্ম সোমবার হয়েছে। وسئل رسوالله -صلى الله عليه وسلم عن يوم الإثنين ؟ قال :ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت ...

''হাদীসে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সা.)-কে সোমবার-বিষয়ক প্রশ্ন করা হলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, সেটি এমন দিন, যাতে আমার জন্ম হয়েছে এবং প্রেরিত হয়েছি। (মুসলিম শরীফ, হা. ১১৬২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩১৯)

জন্মতারিখ :

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহে রবিউল আউয়ালের সোমবারে জন্ম লাভ করেছেন এ কথা স্পষ্ট ও চিহ্নিত, তবে কোন তারিখে হয়েছে, তা নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেন, নির্দিষ্ট তারিখ রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে ও বিভিন্ন রেওয়ায়ত রয়েছে। আল্লামা কসতলানী (রহ.) মোট সাতটি রেওয়ায়াত উল্লেখ

করেছেন। যথা–১. ২ রবিউল আউয়াল। ২. ৮ রবিউল আউয়াল। ৩. ১০ রবিউল আউয়াল। ৪. ১২ রবিউল আউয়াল। ৫. ১৭ রবিউল আউয়াল। ৬. ১৮ রবিউল আউয়াল। ৭. ২২ রবিউল আউয়াল।
(আল- মাওয়াহিবুল লাদুননিয়্যাহ ১/১৪০-১৪২)

আল্লামা যাহেদ কাউছারী (রহ.) বলেন, ৮, ৯ ও ১০–এই তিন মতামত ব্যতীত অন্যান্য মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো এই তিনটি রেওয়ায়াত। আর এ তিনটির কোনটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য এবং কেন?

১০ তারিখের রেওয়ায়াত :

এ রেওয়ায়াতকে ইবেন সা'আদ (রহ.) (মৃ. ২৩০ হি.) মুহাম্মদ বাকের (রহ.) (মৃ. ১১৪)-এর দিকে নিসবত করেন। কিন্তু এ সনদে তিন বর্ণনাকারী এমন রয়েছেন যাঁরা বিতর্কিত, যাঁদের বিষয়ে কালাম রয়েছে। সুতরাং ১০ তারিখের রেওয়ায়াতটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য নয়। আর এ রেওয়ায়াতটির দিকে আল্লাম কাউছারী (রহ.) ইঙ্গিত করেছেন।

এ রেওয়ায়াত নকল করা হয় তবকাতে কুবরা থেকে। রেওয়ায়াতটি হলো,

قال ابن سعد :أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمى قال :حدثنى أبو بكر ابن عبد الله بن أبى سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن أبى جعفر محمد بن على (يعرف بمحمد الباقر) قال :ولد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم الإثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول، ...فبين الفيل وبين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس وخمسون ليلة

অনুবাদ : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী যিনি মুহাম্মদ আল বাকের নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সা.)-এর জন্ম হয়েছে ১০ রবিউল আউয়াল। ...হাতি বাহিনীর অভিযান ও রাসূল (সা.)-এর পবিত্র জন্মের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ৫৫ দিন। (আত-তাবকাতুল কুবরা, ১/১০০)

'১২ রবিউল আউয়াল'-এর রেওয়ায়াত : এ রেওয়ায়াতের বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) কিন্তু তিনি কোনো সনদ বর্ণনা করেননি। এ বর্ণনাটি যদিওবা অধিক প্রসিদ্ধ ও সর্বাধিক প্রচলিত এবং মক্কাবাসী সেই অনেক আগে থেকেই এ দিনেই সিরাত সেমিনার করে থাকেন সাথে সাথে পৃথিবীব্যাপী সভা-সেমিনার এই দিনেই হয়ে আসছে এতদ্বসত্ত্বেও এ রেওয়ায়াতটি প্রমাণসিদ্ধ নয় এবং এই দিনেই যে রাসূল (সা.)-এর জন্ম হয়েছে, তার কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি রেওয়ায়াত পাওয়া গেলেও সেটি মুত্তাসিল না হওয়াতে অগ্রহণযোগ্য বরং তা সনদহীন রেওয়ায়াতের ন্যায়। রেওয়ায়াতটি নিম্নে প্রদত্ত হলো–

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الرَّئِيسُ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :وُلِدَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاثْنَتَىْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ.

মুহাম্মদ ইবেন ইসহাক থেকে বর্ণিত "রাসূল (সা.) জন্মগ্রহণ করেন রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে।" (মুসতাদরাকে হাকেম, হা. ৪১৮৩)

৯ তারিখে জন্মগ্রহণ নিয়ে বিশ্লেষণ : সূত্র ও যুক্তির বিচারে যে মতটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তা হলো, রাসূল (সা.)-এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের আট দিন পর নবম তারিখে।

বর্ণনাসমূহ :

১.আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহ.) (মৃ. ৪৬৩ হি.) এ বিষয়ে মতানৈক্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত মতটি সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। [আল ইস্তি'আব ইবনে আব্দিল বার (রহ.), ১/৩০]

قال أبو عمر :وقد قيل :لثمان خلون منه وقيل...، قيل...، وقيل...

২. হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন,

وقيل لثمان خلون منه حكاه الحميدى عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمى ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية فى كتابه التنوير فى مولد البشير النذير

"কেউ কেউ বলেন, রাসূল (সা.)-এর জন্ম মাসের আট দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবম দিনে হয়েছে। হুমায়দি (রহ.) ইবনে হাযম থেকে বর্ণনা করেন, মালেক, উকাইল, ইউনুস বিন ইয়াযিদ প্রমুখ ইমাম যোহরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতঈম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন। ইবনে আব্দিল বার (রহ.) বলেন, ইতিহাসবিদরা উপরোক্ত মতের সত্যায়ন করেছেন। হাফেযে কবীর মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খারযেমী (রহ.) তাঁকে আরো সুনিশ্চিত ও মাযবুত করেছেন এবং হাফেয আবুল খাত্তাব ইবনে দিহয়া নিজ গ্রন্থে এ রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।"

(আল-বিদায়া আন-নিহায়া ২/৩২০)

৩. হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান (রহ.) (মৃ. ১৩৮২ হি.) লিখেছেন, সাধারণ জনগণের মধ্যে ১২ রবিউল আউয়ালের মতটি অধিক প্রচার-প্রসার হয়, যার ভিত্তি দুর্বল রেওয়ায়াতের ওপর। আর কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরামের মত হলো, ৮ রবিউল আউয়াল, তবে বিশুদ্ধ ও প্রমাণসিদ্ধ মতটি হচ্ছে ৯ রবিউল আউয়াল। বিশ্বখ্যাত জীবনীকার, ইতিহাস রচয়িতা ও আইম্মায়ে হাদীসসহ অনেকেই এ তারিখকে সহীহ ও মজবুত বলেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হুমাইদী (রহ.), উকাইল (রহ.), ইউনুস ইবনে ইয়াযিদ (রহ.), ইবনে হাযম (রহ.), মুহাম্মদ ইবনে মুসা খারযেমী (রহ.), আবুল খাত্তাব ইবনে দিহয়া (রহ.), ইবনে তাইমিয়া (রহ.), ইবনুল কাইয়ূম (রহ.), ইবনে কাসীর (রহ.), ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) ও শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (রহ.)। (কাসাসুল কোরআন ৪/২৫৩)

৪. আল্লামা সুলাইমান নদভী (রহ.)ও ৯ রবিউল আউয়ালকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মতারিখ হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (রাহমাতুল লিল আলামীন, ১/৩৮-৩৯)

যুক্তির বিচারে ৯ রবিউল আউয়াল

১. মুহাম্মদ ইবনে মুসা খারযেমী (রহ.) (মৃ. ২৩৫ হি.) ছিলেন সৌরবিজ্ঞানী। তাঁর মতের কথা আগেই বলা হয়েছে।

২. সৌরবিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা মিশরী (১৩০২ হি.) ফ্রান্সিস ভাষায় "تقويم العرب قبل الإسلام" (ইসলামপূর্ব আরবরে ক্যালেন্ডার) এ বিষয়ে অসাধারণ এক গ্রন্থ রচনা করেন। আরবীতে অনুবাদ করেন, আল্লামা আহমদ যকী পাশা (মৃ. ১৩৫৩ হি.) যার নাম হলো,

" نتائج الإفهام فى تقويم العرب قبل الإسلام وفى تحقيق مولد النبى وعمره عليه الصلاة والسلام "-

এই কিতাবটিতে বহু বৈজ্ঞানিকের উদ্ধৃতিকে সামনে রেখে করা গবেষণা ও বিশ্লেষণে ৯ রবিউল আউয়াল তারিখটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। (নাতায়িজুল আফহাম..., পৃ. ৩৫-৩৮)

উপরোক্ত কিতাবে উল্লেখ করা বিশ্লেষণসমূহ থেকে একটি বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

রাসূল (সা.)-এর পবিত্র যুগে দশম হিজরীর মাহে শাওয়ালের শেষ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। একই দিনেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রা.) মৃত্যুবরণ করেন,

يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم يَعْنِى اِبْن النَّبِىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ ذَكَرَ جُمْهُور أَهْل السِّيَر أَنَّهُ مَاتَ فِى السَّنَة الْعَاشِرَة مِنْ الْهِجْرَة ، فَقِيل ..... وَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهَا وَقَعَتْ فِى عَاشِر الشَّهْر

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন, যেদিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয় ছেলে ইবরাহীম (রা.) মৃত্যুবরণ করেন (সেদিনই সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটে)। অধিকাংশ সীরাত প্রণেতাগণ বলেন, তিনি মারা যান দশম হিজরিতে। কোন মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয় সে বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও সংখ্যাগুরু উলামায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে দশম মাস তথা শাওয়াল মাসে সূর্যগ্রহণের ঘটনাটি ঘটেছিল। (ফাতহুল বারী, ৩/৪৮৯)

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী গণনা করা হলে রাসূল (সা.)-এর জন্মগ্রহণ রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখে হওয়াটাই প্রমাণিত হয়। কেননা, জন্মের দিনটি যে সোমবার এ বিষয়ে তো সাবাই একমত আর সেদিনটি হস্তি বাহিনী ধ্বংসের বছরের রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখেই হয়। এ ছাড়া অন্য তারিখে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা মাহমুদ পাশা বলেন,

"সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেন যে রাসূল (সা.)-এর শুভ জন্মের শুভ দিনটি ছিল সোমবার। (আবরাহার হাতি বাহিনীর অভিযানের বছরের) রবিউল আউয়াল মাসের ৮ কিংবা ১২তম তারিখে সোমবার পাওয়া যায় না। সে মাসের নবম দিনে সোমবার ছিল। সুতরাং নবম দিন ভিন্ন অন্য কোনো তারিখে রাসূল (সা.)-এর জন্ম হয়েছে–এ কথা অগ্রহণযোগ্য বলেই সাব্যস্ত হবে।"

হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান (রহ.) বলেন, মাহমুদ পাশা (কুসতুনতুনিয়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সৌরবিজ্ঞানী ছিলেন) তিনি জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে যে নক্ষত্রসূচি/বর্ষপুঞ্জি প্রণয়ন করেছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের যত ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার একটা সঠিক হিসাব বের করা। তিনি তাতে পূর্ণ তাহকীকের সাথে প্রমাণ করেছেন যে রাসূল (সা.)-এর মোবারক জন্মের বছরে কোনোভাবেই সোমবার ১২ রবিউল আউয়ালে পড়ে না বরং তা একমাত্র ৯ রবিউল আউয়ালেই পড়ে। শক্তিশালী দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে, বিশুদ্ধ সূত্র ও বর্ণনার নিরিখে, জ্যোতির্বিদ্যা ও সৌরবিজ্ঞানের আলোকে রাসূল

(সা.)-এর জন্মগ্রহণের গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য তারিখ হলো ৯ রবিউল আউয়াল। (কাসাসুল কোরআন ৪/২৫৩)

৩. উপরোক্ত নাতায়েজু আফহাম...

নামক গ্রন্থের এক অ্যাডিশনে ভূমিকা লিখেছেন সে যুগের প্রসিদ্ধ ইসলামিক চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ ও বিখ্যাত সাহিত্যিক শায়খ আলি তানতাবী (রহ.) (মৃ. ১৪২০ হি.)। তিনি নিজের লিখিত ভূমিকায় গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক গৃহীত প্রাধান্য পাওয়া ৯ তারিখের মতের পক্ষে জোরদার সমর্থন জুগিয়েছেন। (মুকাদ্দামাতুত তানতাবী, ৮৩)

৪. স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও গবেষক শায়খ আহমদ শাকের (রহ.) (আহমদ বিন মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, মৃ. ১৩৭৭ হি.) তিনিও শায়খ বৈজ্ঞানিক মাহমুদ পাশার গবেষণা মেনে নিয়েছন এবং সে গবেষণা থেকে সূর্যগ্রহণ-বিষয়ক সহযোগিতা নিয়েছেন। (হাশিয়াতুশ শায়খ আহমদ শাকের 'আলাল মুহাল্লা বিল আছার, ৫/১১৪-১১৫)

৫. আরবের গবেষক সৌরবিজ্ঞানী আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (মৃ. ১৪১৬ হি.) লিখেছেন,

"বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুভাগমন হয় ২০ এপ্রিল ৫৭১ ইংরেজিতে আমুল ফিল'-এ...সুতরাং তাঁর জন্ম-মৃত্যুর দিন খুব সূক্ষ্মভাবে বের করা সম্ভব...এর ভিত্তিতে বর্ণনার বিচারে ও যুক্তির আলোকে রাসূল (সা.)-এর জন্মতারিখ হলো ৯ রবিউল আউয়াল হিজরীপূর্ব ৫৩ সনে মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। (তাকভীমুল আযমান, পৃ. ১৪৩)

আরো দ্রষ্টব্য

গবেষণা প্রবন্ধ যার শিরোনাম হলো "تحديد ميلاده الشريف" যা সন্নিবেশিত রয়েছে ماشاع ولم يثبت فى السيرة النبوية নামক গ্রন্থে, লেখক হলেন মুহাম্মদ ইবেন আবদুল্লাহ। সে প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বৈজ্ঞানিক আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীমের উপরোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতামতের আলোকে ৯ তারিখের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপ আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) নিজের রচিত প্রবন্ধ "المولدالشريف النبوى"-এ মাহমুদ পাশার উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং প্রবন্ধ রচনায় তাঁর রচিত কিতাব থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা নিয়েছেন এবং তাঁর সাথে সহমতপোষণ করেছেন। (মাকালাতে কাউসারী, পৃ. ৪০৫-৪০৮) আরো দ্রষ্টব্য হযরত মাওলানা মুফতী ওমর ফারুক সাহেব (শায়খুল হাদীস দারুল উলূম লন্ডন) কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ, যা তাঁর প্রণীত কিতাব ফেকহী জাওয়াহের-এ সন্নিবেশিত, ১/৬৮-৭১

৮ ও ৯ তারিখের বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন

মনে রাখতে হবে, কিছু কিছু উলামা হযরাত ৮ তারিখের মতটি গ্রহণ করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৮ ও ৯ উভয়ের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে। মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব (রহ.) মতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি বলেন, ৮ ও ৯ এর মধ্যে বাস্তবিকার্থে কোনো এখতিলাফ নেই। কেননা তা মাসের ২৯ ও ৩০ এর হিসাবের ওপর নির্ভরশীল। হিসাব করে দেখা যায়, সঠিক তারিখটি ছিল মূলত ২১ এপ্রিল। এ হিসেবে ৮ তারিখের সকল বর্ণনা ৯ তারিখের জন্য সহায়ক হয়ে যায়। (কাসাসুল কোরআন, ৪/২৫৪)

জন্মের সময়কাল : সোমবারের কোন সময়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেন? সীরাতের কিতাবসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম সুবহে সাদিকের সময় হয়েছে আর পবিত্র মক্কা নগরীতে ২০ এপ্রিল সুবহে সাদিক হয় ৪টা ৩৯ মিনিটে। সুতরাং বলা যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৯ রবিউল আউয়াল, হিজরীপূর্ব ৫৩ সনে; ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার আনুমানিক ভোর ৪টা ৪০ মিনিটে এ ধরাতে তাশরীফ এনেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আকল ও নকলের আলোকে, যুক্তি ও সূত্রের বিচারে রাসূল (সা.)-এর মোবারক জন্মের গ্রহণযোগ্য তারিখ হলো, ৯ রবিউল আউয়াল।

জন্মস্থান : জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূল (সা.) পবিত্র জন্মস্থান হলো পবিত্র মক্কা নগরী। তবে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় জন্মলাভ করেন তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম শা'বে বনি হাশেম নামক প্রসিদ্ধ জায়গায় হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বেও মানুষ সে জায়গার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যেতেন। বর্তমানে সে জায়গা বন্ধ করে দিয়ে তাতে মাকতাবা নির্মাণ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মসজিদ স্থানান্তর

মুহা : লিলু মিঞা

বাদশাবাড়ী, দক্ষিণখান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কাওলার বাদশাবাড়ী তাকওয়া জামে মসজিদটি জায়গার স্বল্পতার কারণে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা হতে স্থানান্তর করা যাবে কি না? জায়গা একই মালিকের এবং একই দাগে অবস্থিত। তাতে মসজিদটি বড় এবং তিন দিকে রাস্তাসংবলিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে। আর জায়গা পরিবর্তন করা গেলে মালিক পূর্বের জায়গাটুকু নিজস্ব কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি না? বর্তমান জায়গা ১ শতাংশ। পরবর্তী জায়গা হবে ৩ শতাংশ।

সমাধান :

কোনো জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার পর পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদটি স্থানান্তর করা যাবে না। প্রয়োজনে বহুতল করা যেতে পারে। অথবা রাস্তার উত্তর পাশের জমি নিয়ে মসজিদ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাঝের রাস্তাটি যেহেতু ব্যক্তিগত তাই সেটাকে উত্তর দিক দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে কোনো বাধা নেই। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীয়া-২/৪৫৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-১৩/৩২২, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪৫১)

প্রসঙ্গ : তালাক

মুাহা : সুলাইমান

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আমার দাদা দাদিকে বলেছিলেন, তুমি যদি তোমার বাবার বাড়িতে যাও তাহলে তোমার ওপর তিন তালাক পতিত হবে। দাদি দীর্ঘদিন যাবৎ দাদির বাবার বাড়িতে যায় না। এখন দাদির মা-বাবা ইন্তেকাল করেছে। একটা ভাই ছিল সেও মারা গেছে। শুধু ভাতিজা আছে। এখন আমি মুফতী সাহেব হুজুরের কাছে দুটি মাসআলার সমাধান চাই–

১. বর্তমানে দাদি ভাতিজাদের বাড়িতে গেলে কি তার ওপর তিন তালাক পতিত হবে?

২. এমন কোনো পদ্ধতি আছে কি, যার মাধ্যমে তিন তালাকও পতিত হবে না, আবার দাদি তার পিতার বাড়িতে অর্থাৎ ভাতিজাদের বাড়িতে যেতে পারবে।

সমাধান :

আপনার দাদা দাদিকে তালাকে মুআল্লাক দেওয়ায় বর্তমানে সে পিতার বাড়ি তথা ভাতিজার বাড়িতে গেলেও তার ওপর তিন তালাক পতিত হবে, তা থেকে উত্তোরণের উপায় হলো, আপনার দাদা দাদিকে এক তালাক দেবে এবং দাদি ইদ্দত পালন করে পিতার বাড়ি তথা ভাতিজার বাড়িতে গেলে উল্লিখিত তিন তালাক পতিত হবে না। অতঃপর সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসার পর দাদা তাকে পুনরায় নতুন মোহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে ঘর-সংসার করবে। তার পর থেকে ওই বাড়িতে গেলে আর তালাক পতিত হবে না। (রদ্দুল মুহতার-৩/৭৪৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-১০/৬৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৫/১৫৭)

প্রসঙ্গ : সঞ্চয়পত্র বিক্রয়

মুহা: রবিউল হক

মহাখালী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

সরকার আমাদের মাসিক বেতনের ওপরে প্রচুর আয়কর (ট্যাক্স) নির্ধারণ করেছে। যার ফলে আমরা বহুলাংশে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। যদি সরকারি "সঞ্চয়পত্র" ক্রয় করি তাহলে আয়কর কমে যায় এবং সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে আয়কর পরিশোধ করা যায়। এমতাবস্থায় সরকারি আয়কর পরিশোধ ও কমানোর জন্য সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যাবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

সরকারি আয়কর পরিশোধের জন্য সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যাবে। তবে এর মুনাফা নিজে ভোগ করা যাবে না। (ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-২/১৯৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৪/২০৩, আররিবা-২৮৭)

প্রসঙ্গ : অসিয়ত

মুহা : সিরাজুল ইসলাম

তেজগাঁও, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি শুনেছি যে মৃত্যুর আগে মুসলমানদের অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সে জীবনে যতগুলো ফরয নামায আদায় করতে পারেনি সেটা সদকাতুল ফিতর যেভাবে আদায় করতে হয় ঠিক সেভাবে প্রত্যেক নামাযের কাফ্‌ফারাস্বরূপ দিতে হবে। তা না হলে গোনাহগার সাব্যস্ত হবে। এটা ঠিক কি না? যদি ঠিক হয় তাহলে বিষয়টি আমি আরও পরিষ্কারভাবে জানতে চাই।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত যে মাসআলাটি আপনি শুনেছেন তা সঠিক, অর্থাৎ কারো নামায কাজা হয়ে গেলে জীবদ্দশায় তা আদায়

করবে। আর যদি আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে মৃত্যুর পূর্বে কাজা নামাযের কাফ্ফারা, যা সদকায়ে ফিতরের মতো প্রতি ওয়াক্তের বদলায় পৌনে দুই সের গম বা তার সমমূল্য পরিমাণ টাকা গরিব-মিসকিনদের সদকা করার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব। আর রাত-দিন বিতরসহ মোট ছয় ওয়াক্ত হিসেবে আদায় করতে হবে। (আদদুররুল মুখতার-১/১০১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৩৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/৫০৯)

প্রসঙ্গ : ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়

মুহা: মাহবুবুর রহমান
বসুন্ধরা আর/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমরা তিনজন একটি ডেভেলপার কম্পানি খুলতে চাচ্ছি। আমরা অন্যের জমিতে বিল্ডিং করে ১০টি ফ্ল্যাট হলে জমির মালিককে পাঁচটি ও আমরা পাঁচটি নেব। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো :

১. আমরা যখন ক্রেতার নিকট ফ্ল্যাটগুলো বিক্রি করব তখন তারা ব্যাংক লোন নিয়ে পুরো টাকা আমাদেরকে/ডেভেলপারকে দিয়ে দেবেন। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার লোন পেতে ক্রেতা, ব্যাংক ও ডেভেলপার কম্পানির মধ্যে চুক্তি হয় এবং সবাইকে সই করতে হয়। যদিও আমরা/ডেভেলপার কম্পানি কোনো লোন নিচ্ছি না। সে ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদের কোনো সমস্যা আছে কি না? থাকলে এর সমাধান কী?

২. অনেক ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার আগেই ৫, ৬ তলার ফ্ল্যাট বিক্রি হয় এবং ক্রেতা বিল্ডিংয়ের কাজ শেষ করা পর্যন্ত মাসে মাসে টাকা দেয়। এটি শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান :

১. প্রশ্নোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ব্যাংক লোন গ্রহণকারীর কাছে ফ্ল্যাট বিক্রি করা বৈধ আছে। তবে সুদি লোন নেওয়ার মতো হারাম কাজে দস্তখতের মাধ্যমে ক্রেতাদেরকে সহযোগিতা করায় আপনারা ডেভেলপারগণ অবশ্যই গোনাহগার হবেন।

২. বর্ণিত পদ্ধতিতে ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয় পূর্ব থেকে মূল্য এবং তা পরিশোধের সময় নির্ধারণের শর্তে বৈধ।

প্রসঙ্গ : খোলা তালাক

মুছা : আফসানা আফরোজ
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আমার স্বামী একদিন রাত্রে আমাকে জোরে ধাক্কা মেরে খাট থেকে নিচে ফেলে দেয়। সকালে নাস্তা খাওয়ার জন্য ডাকলে লাঠি দিয়ে বাড়ি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবে বলে হত্যা করার হুমকি দেয়। আমার চরিত্র নিয়ে আমার আত্মীয়স্বজনের নিকট মোবাইলে মিথ্যা অপবাদ দেয়। উল্লেখ্য, বিয়ের পূর্বে আমার স্বামী একবার ও শাশুড়ি চারবার আমাকে দেখে পছন্দ করে নিয়ে যায়। আমার শ্বশুর-শাশুড়িও আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং আমি খাটো, কালো ও কপাল ফাটা ইত্যাদি কথা বলে আমাকে মানসিকভাবে চাপের মধ্যে রাখে। ৪-৫ ভরি স্বর্ণ যৌতুক চাওয়া উচিত ছিল ইহাও বলিয়া থাকে। এর পর আমি আমার পিতার সাথে আমাদের বাসায় বেড়ানোর জন্য চলে আসি। আমি আসার এগারো দিন পর আমার স্বামী আমাদের বাসায় এসে আমার পিতার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করে এবং দাড়ি ধরে টেনেহিঁচড়ে লাথি, কিল-ঘুষি মেরে আঘাত করে। যাওয়ার সময় পরিবারের সবাইকে গায়েব করার হুমকি দিয়ে যায়। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার জীবনের হুমকি, চরিত্র নিয়ে মিথ্যা অপবাদ ও আমার পিতার ওপর নির্যাতনের কারণে আমি আর ওই সংসারে যাব না বলে বলে দেই। উপরোল্লিখিত বিষয়ে আলেম-উলামাদের নিয়ে তিনটি বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয় যে কাজি এনে খোলা তালাকনামা সম্পাদন করা হোক। উক্ত তালাকনামায় আমার স্বামী স্বাক্ষর করার পর আমিও স্বাক্ষর করি। এমতাবস্থায় আমি দেনমোহর ও নফকা পাব কি না? উত্তর দানে বাধিত করতে আপনার মর্জি হয়।

সমাধান :

ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে খোলা তালাক সম্পাদন করার পর স্ত্রী স্বামীর নিকট দেনমোহর দাবি করতে পারে না। আর স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করলে নফকা পায় অন্যথায় তাও পায় না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে আপনি যেহেতু স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করেন নাই তাই দেনমোহর ও নফকা কিছুই দাবি করতে পারবেন না। (রদ্দুল মুহতার-৫/১১৬, আল বেনায়া-৫/৫২৬, আহসানুল ফাতাওয়া-৫/৪৬৫)

প্রসঙ্গ : স্বামীকে তালাক

মুছা : জিয়াসমিন আক্তার
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমি গত ০৭/০৫/১৫ ইং আমার স্বামীর সাথে মিল না হওয়ার কারণে তাকে ১৮ নং ধারা অনুযায়ী তিন তালাক দিয়েছি। এখন আমরা আবার একসাথে থাকতে চাই। শরীয়তের দৃষ্টিতে আমরা একসাথে থাকতে পারব কি না?

সমাধান :

তালাক দেওয়ার ক্ষমতা শরীয়ত কর্তৃক স্বামীকে প্রদান করা হয়েছে। স্ত্রীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তবে স্ত্রী স্বামী কর্তৃক তালাকের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয়ে নিজের ওপর তালাক প্রদান করলে শরীয়তের আলোকে তা গ্রহণযোগ্য

হবে। তালাকের হলফনামায় স্ত্রী নিজের ওপর তালাক প্রদান না করে স্বামীকে তালাক দেওয়ায় তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু তালাকের নোটিশে স্ত্রী স্বামী কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয়ে নিজের ওপর তালাকে তাফবীজ গ্রহণ করায় এক তালাকে রজয়ী পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বামী চাইলে ইদ্দতের ভেতরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। ফিরিয়ে না নেওয়া অবস্থায় ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। উল্লেখ্য স্বামী এখন শুধু দুই তালাকের মালিক থাকবে। (কানযুদ্দাকায়েক-১২৪, হেদায়া-২/৩৮০, কিফায়াতুল মুফতী-৮/২২৬)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা: আহমদুল হক
আক্কেলপুর, রাজশাহী।

জিজ্ঞাসা :

মাটি দ্বারা নির্মিত একটি মসজিদ চতুর্দিকে তিন হাত করে জায়গার ওপর দেয়াল ছিল। কর্তৃপক্ষ পাকা করার সময় উত্তর দিকের দেয়ালের জায়গা বাদ দিয়ে দেয় অর্থাৎ যে তিন হাত জায়গার ওপর মাটির দেয়াল ছিল ওই জায়গাটি পাকা দেয়ালের বাহিরে থেকে যায়। আমার জানার বিষয় হলো দেয়াল শরয়ী মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কি না? হয়ে থাকলে এখন করণীয় কী? জায়গাটি অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল মসজিদের দেয়াল মসজিদের অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে বিধায় পুরাতন দেয়ালের অংশটুকু মসজিদ হিসেবে সংরক্ষণ করা জরুরি। মসজিদসংশ্লিষ্ট নয়, এমন কাজে ওই স্থানটি ব্যবহার করা যাবে না। (আল মুহিতুল বুরহানি-৯/১৩৭, আল বাহরুর রায়েক-৫/৪২১, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৬/১৩)

প্রসঙ্গ : খতমে বুখারী অনুষ্ঠান

মুহা: শামসুল হক
মীরেরবাগ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দেশে প্রায় মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসের সমাপনী দরস উপলক্ষে "খতমে বুখারী" নামে যে অনুষ্ঠান করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কী? বিস্তারিত জানাতে হযরতের সুমর্জি হয়। উল্লেখ্য, কেউ কেউ এই খতমে বুখারী অনুষ্ঠানকে বিদ'আত বলে থাকে।

সমাধান :

বুখারী শরীফ খতম করে দু'আ করার জন্য একত্রিত হওয়া বৈধ, তবে তাকে কেন্দ্র করে আমোদ-ফুর্তি এবং অতিরঞ্জন করা শরীয়তসম্মত নয়। (তফসীরুত তাবরী-৪/৫৬৬, ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া-১৬৬, কিফায়াতুল মুফতী-২/১৩৮)

প্রসঙ্গ : কবিরা গোনাহের সংখ্যা

মুহা: সিরাজুল ইসলাম
তেজগাঁও, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১. কবিরা গোনাহের সংখ্যা কোথাও ৭০টি, কোথাও ১৭৩টি আরেক স্থানে দেখেছি ৩০০টি। এখন কথা হলো, কবিরা গোনাহের সংখ্যা মূলত কতটি নির্ধারিত হয়েছে এবং আপনারা কতটি পেয়েছেন? সেগুলোর তালিকা লিখিতভাবে জানতে ইচ্ছুক।

২. মাযহাব প্রসিদ্ধ ৪টি রয়েছে। কিন্তু ইদানীং প্রায় লোক মাযহাব মানতে চায় না। তারা বলে যে একটি পদ্ধতিই মানব। এটা নিয়ে অনেকেই সংশয়ে আছে। আমি এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে চাই।

৩. মোরাকাবা বা ধ্যান কিভাবে করতে হয়? প্রচলিত কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন কোয়ান্টাম ধ্যান করায়। তো তাদের ধ্যান এবং ইসলামিক উপায়ে ধ্যানের মধ্যে পার্থক্য বা সুবিধা-অসুবিধা জানতে চাই।

সমাধান :

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময় সাহাবায়ে কেরামদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কবিরা গোনাহ থেকে তাদের সতর্ক করেছেন, যার দরুন হাদীসের কিতাব বা ফিকহী কোনো কিতাবে তার নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার বর্ণনা নেই। সংখ্যার পিছে না পড়ে ছোট-বড় সকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

২. কোরআনের আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যায় একাধিক সম্ভাব্য সূরত থাকায় শুধু এক ব্যাখ্যার ওপর আমল করা অসম্ভব। তাই সমগ্র বিশ্বে এক মাযহাব বা এক পদ্ধতি হওয়া সম্ভব নয় এবং চারের অধিক মাযহাবের চর্চা ও অনুসারী না থাকায় চার মাযহাবের ওপর উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যথায় চারের অধিক মাযহাব হওয়াতেও শরীয়তে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না।

৩. ধ্যানের পদ্ধতি কোনো হক্কানী পীর-মাশায়েখের সান্নিধ্যে গিয়ে শিখতে হবে। কোয়ান্টামে কোনো হক্কানী ওলী বুজুর্গ নেই। তাদের কাছে গিয়ে ধ্যান শিখলে ঈমান হারানোর সম্ভাবনা প্রবল।

বি: দ্র: উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ফাতওয়ার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। সরাসরি উপস্থিত হয়ে কোনো বিজ্ঞ মুফতীর সাথে আলোচনা করে অথবা জেনে নিতে পারেন। অথবা পড়তে পারেন শরীয়তের দৃষ্টিতে কোয়ান্টাম, মাযহাব মানি কেন বই দুটো। (ফতহুল মুলহিম- ১/২৫১, মিরকাতুল মাফাতিহ- ১১/১৬৩, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা- ১/১৫৪)

একনজরে মাসিক 'আল-আবরার'-এর বিশেষ আয়োজনসমূহ

হাফেজ মাওলানা সালাহ উদ্দীন

আলহামদুলিল্লাহ। অনুকূল-প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৫ বছর অতিক্রম করল মাসিক আল-আবরার। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে আল-আবরারের সঙ্গী ছিল দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম এবং মুরব্বিদের দু'আ, পাঠকদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা। আল্লাহর অপার কৃপায় এই সাময়িকীটি এখন ষষ্ঠ বছরের যাত্রী। নতুন বর্ষে পদার্পণ মুহূর্তে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীগণকে আল-আবরার পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রতি সুহৃদ পাঠকদের চাহিদা কল্পনাতীত। ফলে অনেক পাঠকই পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে চানতে চান। তাই সকলের সুবিধার্থে মাসিক আল-আবরারের পূর্ণ পাঁচ বছরের বিশেষ বিশেষ লেখা ও প্রবন্ধের সূচিপত্র প্রকাশ করা হলো। বেশ কিছু সংখ্যার অতিরিক্ত কপি আমাদের কাছে নেই। যেসব সংখ্যার অতিরিক্ত কপি আছে তা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়া সব সংখ্যার পিডিএফ ফাইল আমাদের ওয়েবে দেওয়া আছে। যা সহজে ডাউনলোড করা যায়। দু'আ করি, আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন আমাদের এই প্রয়াসকে নাজাতের উসীলা বানিয়ে দেন। আমীন। (আল-আবরার পরিবার)

ফেব্রুয়ারি ২০১২
* শরীয়তের দৃষ্টিতে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা
* ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইরশাদসমূহ
* উম্মতের ওপর অর্পিত মহানবী (সা.)-এর হকসমূহ
* মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ
* আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন
* শাহ আবরারুল হক্ব হারদূয়ী (রহ.)
* পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ
* দু'আ
* কোয়ান্টাম মেথড-১

মার্চ ২০১২
* পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে
* পবিত্র সুন্নাহ থেকে
* শরীয়া মানদণ্ডে মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে
* ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইরশাদসমূহ
* চেয়ারে বসে নামায আদায় প্রসঙ্গ
* পবিত্র কোরআন মজীদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত
* ভালোবাসা : একটি পর্যালোচনা
* হযরত থানভী (রহ.)-এর রচনাসম্ভার
* কোয়ান্টাম মেথড-২
* সায়্যিদ আসআদ মাদানী (রহ.)
* মাওলানা ফজলুর রহমান-এর বয়ান
* মোবাইল : ক্ষতি-ঝুঁকি-১
* আত্মশুদ্ধি
* হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেবের বয়ান
* তারানা

এপ্রিল ২০১২
* DNA টেস্ট-এর মাধ্যমে পিতৃত্ব পরিচয় : একটি ফিকহী পর্যালোচনা
* মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত
* মাল্টি লেভেল মার্কেটিং শরীয়তের দৃষ্টিতে
* এপ্রিল ফুল একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা
* কোয়ান্টাম মেথড-৩
* বাংলা নববর্ষ....ইসলামী হিজরী সন
* হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)
* গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান
* মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের বয়ান
* মোবাইল : ক্ষতি-ঝুঁকি-২
* জ্যোতির্ময় ইসলাম ও চিন্তার সচলায়তন
* সময়ের মূল্য ও মূল্যায়ন

মে ২০১২
* জেলেটিন(Gilatin) : একটি শরয়ী পর্যালোচনা
* মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত
* মাল্টি লেভেল মার্কেটিং শরীয়তের দৃষ্টিতে-২
* আদর্শ নেতৃত্ব
* কওমী মাদরাসা সিলেবাস : প্রাসঙ্গিক ভাবনা
* হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)
* ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ও প্রচলিত মে দিবস
* শরয়ী বিধান পরিপালনে ফিকহ শাস্ত্রের অনিবার্যতা-১
* লঞ্চ, স্টিমার ও পানির জাহাজে নামায আদায়ের শরয়ী বিধান
* তাওবা মু'মিনের সাফল্যের সোপান

জুন ২০১২
* ফাতওয়ার আলোকে ইসলামী সংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি
* মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত
* মাল্টি লেভেল মার্কেটিং শরীয়তের দৃষ্টিতে-৩
* বিজ্ঞান মনস্কতায় মি'রাজের স্বরূপ
* কোরআন বিকৃতির জঘন্যতম অপপ্রয়াস
* হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)
* শরয়ী বিধান পরিপালনে ফিকহ শাস্ত্রের অনিবার্যতা-২
* মাহে রজব পবিত্র রমজানের প্রস্তুতি
* ধার-কর্জে বিড়ম্বনা : পরিত্রাণের উপায়
* হযরত মাওলানা আইয়ূব সাহেব আর নেই

জুলাই ২০১২
* দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র উপায় "যাকাত"
* মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত
* মাল্টি লেভেল মার্কেটিং শরীয়তের দৃষ্টিতে-৪
* জ্ঞান ও ইলম : একটি পর্যালোচনা
* মোবারক হো মাহে রমাজান
* তাসহীহে কোরআনের অপরিহার্যতা
* সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)
* শরয়ী বিধান পরিপালনে ফিকহ শাস্ত্রের অনিবার্যতা-৩
* প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি

আগস্ট ২০১২
* (১) শেয়ারের যাকাত
* (২) চাঁদ দেখা-সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা
* হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী
* মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত
* "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ
* কোয়ান্টাম মেথড-৪
* ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও করণীয়
* উপমহাদেশে কোরআনে করীমের অনুবাদ
* হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)
* শবে ক্বদর ও ই'তিকাফের তাৎপর্য
* প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি-২

সেপ্টেম্বর ২০১২
* বেহায়াপনা ও নগ্নতার সয়লাব-ভয়াবহ গন্তব্যের পথে দেশ ও জাতি
* হাদীসের আলোকে শাওয়ালের ছয় রোযা
* মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজ ও উমরায় গমন
* রাসূল (সা.)-এর যুগে কিয়াস, ইজতিহাদ ও তাকলীদ
* মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-৫
* কোয়ান্টাম মেথড-৫
* মাতা-পিতা ও সন্তানের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব
* মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)
* ইসলামে টুপির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য
* প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি-৩

অক্টোবর ২০১২
* মহানবী (সা.) এর অবমাননা-বিশ্ব মানবতার ওপর চরম আঘাত
* মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবমাননার শাস্তি
* কুরবানী : ফজীলত ও আহকাম
* রাসূল (সা.) কর্তৃক কিয়াসকরণ
* উমরা ও হজ কিভাবে পালন করবেন
* শেয়ারবাজার-১
* কোয়ান্টাম মেথড-৬
* পর্দা : গুরুত্ব ও সীমারেখা
* হযরত আলী (রা.)

নভেম্বর ২০১২
* ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠাই হোক হিজরী নতুন বছরের দৃঢ়প্রত্যয়
* আশুরার তাৎপর্য এবং করণীয় ও বর্জনীয়
* মেডিক্যাল সার্জারি : মাসায়েল ও আহকাম
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৪
* শেয়ারবাজার-২

* কোয়ান্টাম মেথড-৭
* আলেম সমাজের প্রতি বিদ্বেষ : ভয়াবহ পরিণতির দিকে সমাজ
* হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতভী (রহ.)
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-১

ডিসেম্বর ২০১২

* মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত
* "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৫
* শেয়ারবাজার-৩
* কোয়ান্টাম মেথড-৮
* হিজরী নববর্ষ- ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাৎপর্য
* মুসাফাহা : এক হাতে নয় দুই হাতে
* হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-২

জানুয়ারি ২০১৩

* শরীয়তের আলোকে 'ফরেক্স ট্রেডিং'
* "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৬
* শেয়ারবাজার-৪
* কোয়ান্টাম মেথড-৯
* যা রেখে গেলেন মুফতী আমিনী (রহ.)
* শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী প্রসঙ্গে কিছু কথা
* 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' ঈমান ধ্বংসের মহা উৎসব
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৩

ফেব্রুয়ারি ২০১৩

* "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৭
* শান্তিময় জীবনের পথ ও পাথেয়
* দ্বীনি তৎপরতা : আমাদের পরিচয়
* খতমে নবুওয়াত একটি শাশ্বত বিশ্বাস
* রাজনীতে উদিত হয় সূর্য আমার
* মীলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবী (সা.)
* অপরূপ সুন্দর মহানবী (সা.)
* তিনিই হাবীব হে মুহিব
* সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার
* কোয়ান্টাম মেথড-১০
* রাসূল (সা.)-এর মক্কী জীবন
* সন্ত্রাস দমনে বিশ্ব নবী (সা.)
* রক্তঝরা ময়দানে বিশ্ব নবী (সা.)
* আসহাবে রাসূল (সা.)
* মাসিক আল-আবরার এক বছর পূর্তি : একটি সমীক্ষা
* অভিবাদন তোমাকে হে মাসিক আল-আবরার
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৪

মার্চ ২০১৩

* শরীয়তের আলোকে রাসূল (সা.) ও সাহাবা অবমাননাকারীর বিধান
* ইসলামী বিয়ে-১
* "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-৭
* শেয়ারবাজার-৫
* কোয়ান্টাম মেথড-১১
* আল্লামা নূরুল ইসলাম জদীদ (রহ.)
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৫
* একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ : উলামায়ে কেরামের করণীয়

এপ্রিল ২০১৩

* নবী করীম (সা.)-এর অবমাননা মুসলমানদের করণীয়
* প্রসঙ্গ : কুনূতে নাযেলা
* ইসলামী বিয়ে-২
* ইমামে আ'যম আবু হানীফা (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও আলেম ছিলেন
* শেয়ারবাজার-৬
* কোয়ান্টাম মেথড-১২
* হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৬

মে ২০১৩

* শরীয়তের আলোকে ক্রেডিট কার্ড
* ইসলামী বিয়ে-৩
* "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-১০
* মদীনা সনদ
* কোয়ান্টাম মেথড-১৩
* হযরত তালহা (রা.)
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৭
* নারী অধিকার : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

জুন ২০১৩

* শরীয়তের আলোকে গায়েবানা নামাযে জানাযা
* ইসলামী বিয়ে-৪
* "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-১১
* উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য
* কোয়ান্টাম মেথড-১৪
* হযরত থানভী (রহ.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-১
* ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

জুলাই ২০১৩

* শবে কদর
* তারাবির নামায ২০ রাক'আত পড়াই সুন্নাত
* ইসলামী বিয়ে-৫
* মাযহাব মানার শরয়ী বিধান
* সারা বিশ্বে একই দিন রমাজানের রোযা আরম্ভ ও
* ঈদ উদ্‌যাপন : একটি পর্যালোচনা
* রোযা, ইতিকাফ, শবে কদর, সদকায়ে ফিতির, ঈদ তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল
* কোয়ান্টাম মেথড-১৫ : নতুন দৃষ্টিভঙ্গি
* হযরত থানভী (রহ.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-২
* ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
* হযরত শাহ হাকীম আখতার (রহ.)
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৮

আগস্ট ২০১৩

* পর্দা
* শবে ঈদ
* ইসলামী বিয়ে-৬
* মাযহাব না মানলে...
* মহিলারা মসজিদ ঈদগাহে যাবে কি না?
* যাকাত : ফাজায়েল, আহকাম ও মাসায়েল
* কোয়ান্টাম মেথড-১৬
* বদলে গেছে লাখো জীবন!!
* হযরত থানভী (রহ.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-৩
* ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
* আল্লামা শাহ ইসহাক (সদর সাহেব হুজুর) (রহ.)
* আল্লামা কাজি মুতাসিম বিল্লাহ (রহ.)
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-৯

সেপ্টেম্বর ২০১৩

* তাহাজ্জুদের ফজীলত
* ইসলামী বিয়ে-৭
* নামাযের কতিপয় মাসায়েল : বিভ্রান্তি ও নিরসন
* দেওবন্দিয়াত- 'এটি কোনো ফিরকা নয়'
* কোয়ান্টাম মেথড-১৭
* মাটির ব্যাংক
* হযরত থানভী (রহ.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-৪
* ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
* মারকাযে ক'টি দিন
* নবীজি (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-১০

অক্টোবর ২০১৩

* ধন-সম্পদের কুফল ও তার প্রতিকার
* তালিবে ইলমের ফজীলত
* 'টেস্ট টিউব বেবি' একটি ফিকহী পর্যালোচনা
* ইসলামী বিয়ে-৮
* মুক্তাদির সূরায়ে ফাতেহা পড়ার বিধান
* ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন
* কোরআন-হাদীসের আলোকে কুরবানী
* কোয়ান্টাম হিলিং
* হযরত থানভী (রহ.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-৫

নভেম্বর ২০১৩

* অ্যালকোহল মিশ্রিত ওষুধের শরঈ বিধান
* ইসলামী বিয়ে-৯
* সূরা ফাতেহা শেষে "আমীন" আস্তে বলা সুন্নাত
* পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিষফল
* কোয়ান্টাম মেথড-১৯ : ধ্যান মুরাকাবা মেডিটেশন
* হযরত থানভী (রহ.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-৬
* হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
* মুহাররম : তাৎপর্য, করণীয় ও বর্জনীয়
* রাসূল (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন

ডিসেম্বর ২০১৩

* ইসলামী বিয়ে-১০
* নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা সুন্নাত
* "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এতে সংশয় সৃষ্টির অপপ্রয়াস : রহস্য কী?
* জীবনের সফলতা অর্জনে 'খানকা'র গুরুত্ব ও প্রভাব
* কোয়ান্টাম মেথড-২০ : ধ্যানের অপব্যবহার
* সংখ্যালঘু অমুসলিমদের উপাসনালয়ে

হামলা! ইসলাম কী বলে?
* হযরত থানভী (রহ.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-৭
* হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
* স্বাস্থ্য সচেতনতা : শরয়ী অবস্থান
* রাসূল (সা.) যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন-১২

জানুয়ারি ২০১৪
* শরীয়তের আলোকে রওজা পাকের যিয়ারত
* ইসলামী বিয়ে-১১
* বিতির নামায এক সালামে ৩ রাক'আত
* নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী
* সীরাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান
* সুন্নতি আদর্শ ও আজকের দাবি
* মক্কা বিজেতার অনুকম্পা
* নবী (সা.)-এর অনুসরণের সঠিক পন্থা–
* পূর্বপুরুষদের অনুকরণ
* নবী চরিত্রের কিছু অনন্য সৌন্দর্য
* সীরাতের একটি নিভৃত অধ্যায় 'রাবায়েবুন্নবী' (সা.)

ফেব্রুয়ারি ২০১৪
* ইসলামী বিয়ে-১২
* কাযা নামায পড়ার বিধান
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১
* রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত তরিকায় নামায পড়ি
* তুরাগ তীরে বিশ্ববাসীর ইজতিমা
* তাসাওফ বনাম প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র
* মারকাযে সালানা ইসলাহী ইজতিমা : ব্যতিক্রমধর্মী এক নূরানী আয়োজন
* নারী নির্যাতন রোধে ইসলাম
* ইসলামে মানবাধিকার-১

মার্চ ২০১৪
* শরীয়তের দৃষ্টিতে জবরদখল ও তার কতিপয় বিধান
* ইসলামী বিয়ে-১৩
* ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার শরয়ী বিধান
* দেওবন্দিয়ত শতাব্দীর একটি 'তাজদীদি' চিন্তা-চেতনার নাম
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২
* ফরয নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা
* এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব
* আলেম সমাজের প্রতি কেন এত বিষোদগার?

এপ্রিল ২০১৪
* ফিতনার এই যুগে-
* আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরজ
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৩
* তাবলীগি কাজের সূচনা
* লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবিস্মরণীয় কীর্তি
* ডিভোর্সের নেপথ্য কারণ
* এপ্রিল ফুল বনাম মুসলিম উম্মাহ
* ইসলামে মানবাধিকার-২

মে ২০১৪
* আসুন গোনাহমুক্ত জীবন গড়ি
* সত্যসন্ধানী লা-মাযহাবী ভাইদের প্রতি ভেবে দেখার আহ্বান
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৪
* তাবলীগি কাজের সূচনা-২
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১
* 'উমরী কাযা'-এর শরয়ী বিধান
* ইসলামে মানবাধিকার-৩

জুন ২০১৪
* ফুযালাদের প্রতি মূল্যবান নসীহত
* মহিলাদের নামায পুরুষদের নামায থেকে ভিন্ন
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৫
* শবে বরাত নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন
* তাবলীগি কাজের সূচনা-৩
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-২
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার
* ইসলামে মানবাধিকার-৪

জুলাই ২০১৪
* যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল
* এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাকের শরয়ী বিধান
* রোযা, তারাবীহ, লাইলাতুল কদর
* তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৬
* বিতর নামাযের সঠিক পদ্ধতি
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৩
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার

আগস্ট ২০১৪
* বিপদ-আপদ : কারণ ও প্রতিকার
* হাদীস ও সুন্নাহ : বিভ্রান্তি ও নিরসন
* সদকায়ে ফিতর ও ঈদ তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৭
* সারা বিশ্বে একই দিনে রমাজানের রোযা আরম্ভ ও ঈদ উদ্‌যাপন : একটি পর্যালোচনা
* তাবলীগি কাজের সূচনা-৪
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৪
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৩
* ইসলামে মানবাধিকার ৫

সেপ্টেম্বর ২০১৪
* "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ
* হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ ও তার নিরসন
* হজ ও উমরা তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৮
* তাবলীগি কাজের সূচনা-৬
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৫
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৪

অক্টোবর ২০১৪
* নির্ধারিত এক মাযহাবের তাকলীদ ও অতীতের উলামায়ে কেরাম
* কুরবানী : তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৯
* দারুল উলুম দেওবন্দ দ্বীন প্রচারের সূতিকাগার
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৬
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৫
* ইসলামে মানবাধিকার-৬

নভেম্বর ২০১৪
* রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত
* ধর্মদ্রোহিতা : কারণ ও প্রতিকার
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১০
* শাহাদাতে হুসাইন (রা.) ও শিয়া সম্প্রদায়
* আশুরার তাৎপর্য ও করণীয়
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৭
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৬
* মলফূজাতে আকাবের

ডিসেম্বর ২০১৪
* নারী-পুরুষের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস
* অলিমা কখন ও কিভাবে
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১১
* মৃত্যুর পর লাশ দাফনে বিলম্ব : ইসলাম কী বলে?
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৮
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৭

জানুয়ারি ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন
* মীলাদুন্নবী (সা.) পালনের সঠিক পদ্ধতি
* খতমে নবুওয়াত ও কাদিয়ানী মতবাদ
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১২
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৯
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৮

ফেব্রুয়ারি ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২
* সুন্নাতের অনুসরণই কামিয়াবীর একমাত্র পথ
* আযানের সঠিক পদ্ধতি ও জামা'আতে নফল নামায পড়ার বিধান
* জামা'আতবদ্ধ নামাযে কাতার সোজা করা ও
* কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর গুরুত্ব ও পদ্ধতি
* মুসলিম সমাজে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৩
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১০
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৯

মার্চ ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৩
* আত্মশুদ্ধির পথে করণীয়
* শরীয়তের দৃষ্টিতে আকীকা, খতনা ও কাফন-দাফন
* নবীজির (সা.) উত্তম চরিত্রই হোক আমাদের জীবনপাথেয়
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৪
* কোরআন-সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১১
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১০

এপ্রিল ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪
* জাতীয় সংকট : সমাধান কোন পথে
* ইসলামে ছবি ভিডিও ও ভাস্কর্য নির্মাণের বিধান
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৫
* প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় মাতা-পিতার ভূমিকা
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১২
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১১

মে ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৫
* অসুস্থতাও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত
* ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত (প্রাণীর) ছবি ও ভিডিওর হুকুম
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৬
* "এক মুহূর্ত ফিকির করা ৬০ বছর ইবাদত হতে উত্তম"
* কওমী মাদরাসা নিয়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য বনাম বাস্তবতা
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১৩
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১২

জুন ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৬
* বেমালুম ভুলে যাওয়া ফজীলতপূর্ণ একটি মাস
* টিভি প্রোগ্রামে উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণ : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি
* মাহে রমাজান ও রোযা : তাৎপর্য ফজীলত মাসায়েল
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৭
* পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে শবে বরাত
* পোশাক সংস্কৃতি বনাম প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা
* লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১৪
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৩

জুলাই ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৭
* যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল
* নেয়ামতের হিসাব দিতে হবে
* ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলিল
* শবে কদর, সাদকাতুল ফিতর, ঈদ ফাজায়েল ও মাসায়েল
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৮
* তারাবীতে কোরআন খতমের বিনিময়
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৪

আগস্ট ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৮
* হজ ও উমরা : তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল
* আদর্শ তালেবে ইলম
* লা-মাযহাবী বন্ধুরা! দয়া করে জবাব দেবেন কি?
* হজের তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৯
* নবীজি (সা.)-এর হজ : (কিছু শিক্ষণীয় বিষয়)
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৫

সেপ্টেম্বর ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৯
* কোরবানী : ফাজায়েল ও মাসায়েল
* আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত ইখলাস
* গায়রে মুকাল্লিদদের ইমাম
* মরহুম আলবানী সাহেবের প্রকৃত পরিচয়
* নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনা : কিছু কথা কিছু নিবেদন
* বন্য প্রাণীর কোরবানী
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২০
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৬

অক্টোবর ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১০
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল
* নববী আদর্শের কিছু নমুনা
* মসজিদ-সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল
* জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আও আদায় করতে হবে
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২১
* হিজরী নববর্ষ ইতিহাসের পুনর্পাঠ
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৭

নভেম্বর ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১১
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-২
* সুদের ভয়াবহতা : বাঁচার উপায়
* দ্বীনের দাঈ ও খাদেমদের পরস্পর সম্পর্ক-কেমন হওয়া উচিত?
* শরীয়তের দৃষ্টিতে চেহারার পর্দা
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২২
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৮

ডিসেম্বর ২০১৫
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১২
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৩
* হারাম উপার্জনের ভয়াবহতা
* লা-মাযহাবী ফিতনা ও কিছু কথা
* বিরল প্রতিভার চিরবিদায়
* দেশ ও জাতির সেবায় ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর অবিস্মরণীয় অবদান
* অমুসলিম দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের পাথেয় হিজরতে হাবশা
* বিদায় ফকীহুল মিল্লাত : ভালো থাকবেন পরকালেও
* নবী প্রেমের স্বরূপ
* ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

জানুয়ারি ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৩
* উস্তাদের দু'আ সফলতার পাথেয়
* লা-মাযহাবী ফিতনা ও কিছু কথা-২
* স্থানীয় ভাষায় জুমু'আর খুতবা : শরীয়ত কী বলে?
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৩
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৯
* ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইন্তেকাল: একজন মহান সাধকের বিদায়
* হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন দ্বীন ও মিল্লাতের অতন্দ্র প্রহরী
* হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন একজন বহুমুখী জ্ঞান ও গুণের অধিকারী মহান ব্যক্তিত

ফেব্রুয়ারি ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৪
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৪
* একটি সর্বগ্রাসী ফেতনা ও তার প্রতিকার
* ঘুষ : একটি পুরনো অভিশাপ
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৪
* মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ২০

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে
* বিশ্বখ্যাত উলামায়ে কেরামের বেদনাহত অভিব্যক্তি
* ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইন্তেকালে জাতি একজন দরদি ও দূরদর্শী অভিভাবক হারাল
* আমার স্মৃতিতে হযরত ফকীহুল মিল্লাত রহ.
* জামিয়া পটিয়ায় হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে 'যিকরে খায়র' ও দু'আ মাহফিল

মার্চ ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৫
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৫
* হারানো প্রশান্তির সন্ধানে
* বিভিন্ন গোমরাহ দল : উলামায়ে কেরামের করণীয়
* তাসবীহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি : একটি দালিলিক বিশ্লেষণ
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৫
* ইকবালের কবিতায় নারী
হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে
* ইলমে ফিকহ চর্চার পথিকৃৎ এক মুজাদ্দিদ
* সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর অবস্থান অনুসরণীয়

এপ্রিল ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৬
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৬
* তাওবা-ইস্তেগফার ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার উপায়
* বিভিন্ন গোমরাহ দল : উলামায়ে কেরামের করণীয় (শেষ কিস্তি)
* ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৬
* ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা–১
হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে
* যুগের আবু হানীফা

মে ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৭
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৭
* শবে বরাতের ফজীলত ও করণীয়
* হযরত থানভী (রহ.)-এর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার ফসল
মজলিসে দাওয়াতুল হক
* দস্তরখান : একটি পর্যালোচনা
* ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-২
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৭
* ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা–২
* যানবাহনে নামায আদায়ে কিবলার বিধান

জুন ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৮
* মাহে রমাজান ও রোযা তাৎপর্য ফজীলত মাসায়েল
* সুরক্ষিত রমাজান বছরজুড়ে প্রশান্তি
* হযরত থানভী (রহ.)-এর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার ফসল
মজলিসে দাওয়াতুল হক (শেষ পর্ব)
* দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায়ের শরয়ী বিধান
* ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-৩
* মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৮
* প্রচলিত ওজনে শরয়ী পরিমাপ

জুলাই ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৯
* যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল
* ইসলাহে বাতেন সাফল্যের মূল উৎস
* হযরত থানভী (রহ.)-এর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার ফসল
* মুসল্লিগণ নামাযে কিভাবে দাঁড়াবেন?
* সাদকাতুল ফিতর, ঈদুল ফিতির
* শবে কদর ও ই'তিকাফের তাৎপয
* তারাবীহ বিশ রাক'আত ও তাহাজ্জুদ আট রাক'আত
* নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্য
* ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-৪

আগস্ট ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৯
* হজ ও উমরা তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল
* সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা ইসলাম ও মানবতার শত্রু
* কোয়ান্টাম মেথড একটি ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ
* ইসলামী অঙ্গনে চিন্তার সন্ত্রাস
* মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজীর হেদায়াত-১
* ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৩
* হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রহ.)
* ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-৫

সেপ্টেম্বর ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২১
* কোরবানী : ফাজায়েল ও মাসায়েল
* দু'আ ইবাদতের নির্যাস
* টিভি, সিনেমা এবং ভিসিআর দেখার ক্ষতিসমূহ
* মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজীর হেদায়াত-২
* ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৪
* কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা সিলেবাস ও সরকারি স্বীকৃতি : অযাচিত মন্তব্য-বক্তব্য
* প্রশ্নোত্তরে কতিপয় সহজ আমল
* ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-৬

অক্টোবর ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২২
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৮
* প্রকৃত মানুষ
* অন্তরের ১০টি রোগের চিকিৎসা এবং ১০টি গুণ হাসিল
* ঐতিহাসিক পবিত্র আরফার ময়দানে হজের খুতবায় শায়খ আব্দুর রহমান সুদাইস : ইসলামই আল্লাহর মনোনীত সার্বজনীন ধর্ম
* ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৫
* মসজিদ নারীদের নামাযের স্থান নয়
* হিজরী নববর্ষ : করণীয়-বর্জনীয়
* ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-৭

নভেম্বর ২০১৬
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৩
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৯
* প্রকৃত আলেম
* দ্বীনের দাঈ ও খাদেমদের পরস্পর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?
* মাযহাব অনুসরণ; তাৎপর্য ও বাস্তবতা
* কাউকে অবজ্ঞা ও উপহাস করার পরিণতি
* ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৬
* দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি,
* শিক্ষানীতি ও আত্মসংশোধন পদ্ধতি
* আল্লামা শায়খ শোয়াইব আরনাউত আর নেই

ডিসেম্বর ২০১৬
* বিজয় ও খুশি উদ্‌যাপনে ইসলামী তরীকা
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৪
* মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার
* বন্ধুত্ব ও শত্রুতা
* সন্তানের আখলাক-চরিত্র রক্ষায় সচেষ্ট হোন
* মাযহাব অনুসরণ; তাৎপর্য ও বাস্তবতা-২
* মেয়েদের বিয়ের বয়স ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহ
* সচ্ছল জীবনযাপন ও মহানবী (সা.)
* একনজরে সীরাতে সায়্যিদুল মুরসালীন (সা.)

জানুয়ারি ২০১৭
* মুনাফিকরাই সবচেয়ে ভয়ংকর
* 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৫
* পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৯
* আমলের গুণ-মান ও সৌন্দর্য্য
* ঈমান-আমল ঠিক রাখার জন্যই দাওয়াতের মেহনত
* একত্রে তিন তালাক প্রদান : শরীয়ত কী বলে
* ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৭
* নামাযে কোরআন দেখে দেখে পড়ার শরয়ী বিধান
* ঋণ আদান-প্রদানে ইসলামী নীতিমালা
* ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-৮

সংকলক : সার্কুলেশন ম্যানেজার, মাসিক আল-আবরার।